দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি

আমরা লেখক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি তুলে ধরে, তা উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র কিংবা বিভিন্ন ঘটনা বা প্রসঙ্গ অবলম্বনে কীভাবে ফুটে উঠেছে তা দু'ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করব। যথা-

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

খ) উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি।

ক) উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে যতটুকু দেখেছেন, জেনেছেন; সেটুকু খুব নিবিড়ভাবে দেখা ও জানা। আর সেই অভিজ্ঞতাকে মূলধন করে গড়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসগুলোর জগত। আর উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলো যেন লেখকেরই বিভিন্ন সত্তার বিভিন্ন রঙে রাঙানো। তাই এত সজীব ও সরস। এই চরিত্রগুলো ঘিরেই প্রকাশিত হয়েছে লেখকের জীবন-ভাবনা বা জীবনদৃষ্টি। জীবনদৃষ্টি বলতে এখানে আমরা বুঝিয়েছি, জীবনকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন, জীবন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা কিংবা অনুভব ও উপলব্ধি। লেখক বলেছেন, ''আমার মনে হয় শিল্পের বিষয় হল: সংশয় । আর ভক্তের বিষয় হল: সমর্পণ-নিবেদন। এই দুটি দু'রকমের জিনিসের ভেতর সংশয় নিয়েই সারা পৃথিবীর শিল্পের ইতিহাস। আমাদের আগে— আমাদের সময় এবং আমাদের পরেকার যাঁরাই লিখতে এসেছেন তাঁদের ভেতর শতকরা ৯৯ জন এই সংশয়ে দুলতে দুলতেই লিখে চলেছেন। শিল্প কোন মীমাংসা নয়। শিল্প একটি দোলাচল তর্কের ভেতর ছিন্ন-দীর্ণ হতে হতে যা পাওয়া যায় তাই।''[১]

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই সংশয়ী মন নিয়েই জীবনকে ভালোবেসেছেন। মানুষকে দেখেছেন। জগৎকে বুঝেছেন। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যত খনন করেছেন, এক পৃথিবী-বিস্ময়ে তাঁর হৃদয় ভরে গিয়েছে। তখন তিনি আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে আরও খনন করেছেন। যা পেয়েছেন, সেই প্রাপ্ত সম্পদে তিনি ক্রমাগত ধনী হয়েছেন। এই জীবন ও জগৎ যেন লেখককে চেয়েছিল, তাই মানুষ ও প্রকৃতি যেন বৈচিত্র্য-সম্ভার নিয়ে হাজির হয়েছিল তাঁর কাছে। আর শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় আপাদমস্তক দিয়ে চেটেপুটে তার স্বাদ গ্রহণ করেছেন। এভাবেই লেখকের একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন, ''দেখার দৃষ্টি থেকে আপনা-আপনি জমা

হতে হতে যদি লেখকের কোন দার্শনিক ভাবনার পত্তন না হয়— ... তবে তাঁর লেখা যতই নিপুণ হোক— যতই অভিনব হোক— তা আপনাআপনি নড়বড়ে হয়ে যাবেই— তলিয়ে যাবেই।

এই দার্শনিক ভাবনা তখনই একজন লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে জেগে ওঠে— যখন তিনি মানুষ হিসেবে বারংবার নিজের বিশ্বাসের জায়গা হাতড়ে চলেন— নিজেকে ভাঙেন— খুঁজে বেড়ান— নিজেকে নিশ্চিহ্ন করার ঝুঁকি নিয়ে— নিজেকে দৈবী অতৃপ্তির— অস্থিরতার শিকার হতে দিয়ে— ঘাম ঝরিয়ে কোনও ভাবনার অধিকারী হন।"[২] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনের ইতিহাস বলে, এই কাজগুলো তিনি হৈ হৈ করে করেছেন। আমরা এই অধ্যায়ের এই অংশে নির্বাচিত উপন্যাসের নির্বাচিত প্রধান চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে কীভাবে কী জীবনদৃষ্টি ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করব।

ছদ্মবেশে ক্রমাগত ধুঁকছিল 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রমথ দত্ত। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় গতিময়তার যুগে আমরা নিজেদের চেতনে বা অবচেতনে নিজেরাই ধুলো দিয়ে চিত্র বিচিত্র ছদ্মবেশ তৈরি করে ফেলি। তারপর শুধু সেই ছদ্মবেশ ধারণ করে জীবনের রাস্তায় চলে ফিরে বেড়ানো। এক ধরনের মিথ্যে মজা তখন সঙ্গী হয়। পেছনে ফিরে নিজেকে নিয়ে ভাবার অবকাশ মেলে না। তাহলে সমস্যা কোথায়? সমস্যা প্রমথ দত্তের বা এই রকম মুষ্টিমেয় মানুষের। ছদ্মবেশের সুতোগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত অক্ষত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সেই ছদ্মবেশের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

প্রমথ দত্ত একটি নিম্নমধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারে বড় হয়ে উঠেছে। সাধারণ বাঙালি নিম্নমধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার প্রদত্ত সংস্কার, মূল্যবোধ, বিশ্বাস তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু যতই সে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে, পিছলে পিছলে গিয়েছে এই বিশ্বাসগুলো। ফলে আমাদের 'শায়ক মনোবৃত্তি' ছদ্মবেশ তৈরি করে। কারণ এই বিশ্বাসগুলোতে তিক্ত শর নিক্ষেপ করেই আমরা সাময়িক শান্তি পেতে চাই। যেভাবে প্রমথ দত্ত সাময়িক শান্তি পাচ্ছিল। তার বর্তমান জীবনশৈলী তাকে ছদ্মবেশের পোষাক তৈরি করে দেয়। কিন্তু এই পোষাকের যে মজা সে অনুভব করছিল, ধীরে ধীরে তার ভিতরে থাকা মিথ্যা বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দেয় তার সামনে। ফলে, পরিবারের প্রত্যাশা কাঁধে নিয়ে, অনেক নারীসঙ্গ লাভ করে কর্মহীন প্রমথ ধুঁকতে থাকে। সে চেষ্টা করে নিজেকে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে। সে চেষ্টা করে পরিবারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিতে। সে চেষ্টা করে সত্যিকারের ভালোবাসায় পড়তে। সে চেষ্টা করে নিজের বিবেকের কাছে সৎ হতে।

কিন্তু তার কোনও চেষ্টাই সেভাবে ফলপ্রসু হয় না। কারণ আমাদের মনে হয়, প্রমথর ইচ্ছাশক্তির

অনেকটা অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। কারণ প্রমথ দত্ত ততদিনে সহজলভ্য শান্তি, সুখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই সহজলভ্যতা ও সাময়িকতা মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে শুষে নিতে পারে। ব্যক্তি মানুষের এই সংকট মানুষকে আরও সংশয়ী করে তোলে। এই সংশয়ী মন নিয়ে তখন সে যেখানেই যায় অভ্যস্ত হওয়া মজার স্বাদ পান্‌সে লাগে। যেমন লাগছিল প্রমথ দত্তের। এই স্বাদ পান্‌সে হওয়া অনিবার্য ছিল। কারণ ভিত্তিমূলেই রয়েছে কৃত্রিমতা, মিথ্যা। আবার যেখানে শুধু জৈবিক চাহিদা মেটানো একমাত্র উদ্দেশ্য, তার মজার স্বাদও পান্‌সে হতে বাধ্য। তাই বর্তমানে সুধার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্কে (ভালোবাসার নয়) উন্মাদনা আর তেমন নেই। কিন্তু দীর্ঘদিনের মেলামেশার অভ্যেস এবং মিথ্যা মজা পাওয়ায় (সহজলভ্য) অভ্যস্ত হওয়া প্রমথের আলস্য তাকে পুরোপুরি সত্যের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে সাহস দেয় না বা পায় না। এজন্য প্রমথ নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয়, ‘‘... সে সুধাকে ভালবাসে। মুশকিল হয় সুধার দিকে তাকালে । বমি আসে। প্রমথ তখন মনে মনে বারেবারে আওড়ায়, সুধাকে ভালবাসি। আমি সুধার লাভার। সুধা একা।’’[৩] ভালোবাসার অন্বেষণে থাকা প্রমথর দৃষ্টি পড়ে অঞ্জুর (সুধার ছোট বোন) দিকে। কিন্তু সেখানেও সে ব্যর্থ হয়। কারণ ভালোবাসতে না পারাটাই এখন প্রমথর কাছে অভ্যেস হয়ে গেছে। জৈবিক চাহিদার কাছে মাথা নত করা অভ্যেস হয়ে গেছে। প্রমথর সহজ স্বীকারোক্তি, ‘‘প্রমথ অঞ্জুকে ভালোবাসে না। এমন কী অঞ্জুকে তার ভালও লাগে না। ... তবু কিছু রহস্য আছে অঞ্জুর। এমন আন্তরিকভাবে ঠোঁট টিপে চোখ মটকায় যে ভীষণ লেপ্‌টে থাকতে ইচ্ছে করে।’’[৪]

অন্যদিকে বাঙালি ঘরের তথাকথিত আইবুড়ো মেয়ে সুধার প্রমথকে আটকে রাখার ঐকান্তিকতায় প্রমথ কষ্ট পায়, হাঁসফাঁস করে। তাই যতটা সম্ভব সে সুধাকে ভালো না বাসাটা ঢেকে রাখতে চায়। ঢেকে রাখতে গিয়েই তাকে চুপ করে থাকতে হয়। কারণ কথা বললে নিজের অজান্তেই যদি নিজের প্রকৃত মনোভাবটা সুধার সামনে ফুটে ওঠে। তাছাড়া বেকার প্রমথের অনেক খুচরো প্রয়োজনে অর্থের জোগান দেয় চাকুরিজীবি সুধা। ফলে ক্রমশ প্রমথর সঙ্গে সুধার এক কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রমথর দিক থেকে এই কৃতজ্ঞতা অর্থের আর সুধার দিক থেকে ভালো বর পাওয়ার প্রত্যাশায়।

এই পরিস্থিতি প্রমথর অস্তিত্বের সংকটকে আরও গভীর করে তোলে। সুধা তার জীবনে প্রথম নারী নয়। নারী অনেক ভাবেই প্রমথর কাছে ধরা দিয়েছে। ফলে এখন যেন সে ছদ্মবেশে ধুঁকতে শুরু করেছে। নিজের তৈরি বানানো ধারণাগুলো যখন নিজেকেই বিদ্রুপ করতে থাকে, সমস্ত প্রচেষ্টার

যোগফল হিসাবে শূন্য একটি প্রশ্নের আকারে নিজের সামনেই ঝুলতে থাকে; তখন প্রতি পদে পদে নিজের মধ্যে অন্য একজনের কাছে হারতে হারতে প্রমথ যেন অপেক্ষায় থাকে নতুন সতেজ, সবুজ শস্যভূমি আবিষ্কারের। কারণ সমাজের প্রাণহীনতা, স্থবিরতা তাকে শুষ্কতায় তলিয়ে নিয়ে যায়। ব্যক্তিসত্তার সংকটের দ্বন্দ্ব কখনও একতরফা হতে পারে না। তাই প্রমথ নিজের সম্পর্কে নিজের উপলব্ধিগুলো বাঁচিয়ে রাখে লড়াই করার জন্য। এটা যেন অনেকটা খ্রিষ্টীয় রীতিতে নিজের কাছে নিজের কনফেশন। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় দেখেছেন মানুষ সংকটের সময় এভাবেই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে।

সুধা বা অঞ্জু নয়, প্রমথ আরও অনেক মেয়েদের (ইন্দিরা, কনসিডারেট) সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছে। এরপরেও ভালোবাসা মরীচিকা হয়েই থেকেছে প্রমথর কাছে। এই সব সম্পর্কের সেতু পেরিয়ে তার উপলব্ধি, ''কাউকে ভালবাসি না। ভালবাসার ক্ষমতা নেই আমার। শুধু চাকরিই প্রতিবন্ধক না। আমি আমার প্রতিবন্ধক। জান্তব ধস্তাধস্তিতে, সাময়িক জড়াজড়িতে আমি স্থির হই— ঘন মুহূর্তের স্বীকৃতিতে আমি প্লুত হই। এমন কী শারীরিক ঘষাঘষিতে পুরুষার্থ অর্থবহ হয়— কিন্তু তবুও আমি নপুংসক।''[৫] এই নপুংসকতার (শারীরিক নয়, মানসিক) জন্ম হয় কৃত্রিমতা থেকে। কৃত্রিম মজা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। মহাভারতের অর্জুনের বৃহন্নলার ছদ্মবেশ যেমন অর্জুনের মূল রূপকে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিল, তেমনি আধুনিক যুগের মানুষ প্রমথ দত্তের বৃহন্নলার ছদ্মবেশ তারপ্রকৃত রূপকে আচ্ছাদিত করে দেয়। ভালোবাসাহীন শারীরিক ঘষাঘষি এভাবেই আমাদেরকে নপুংসক করে তুলছে।

প্রমথ দত্ত নিজের চোখে মহিষের কাজল অনুভব করে। খুব অন্ধকার সেই কাজলে আঁসটে গন্ধ। প্রমথর চোখ লাল হয়, ফলে সে যা দেখে তাই লালচে। দেখেই ফুলে ওঠে ঘোঁত ঘোঁত করে এগোয়। কিন্তু কেন? এই প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের কিছু লাইন পড়া যেতে পারে। সত্যচরণ নিজের সম্পর্কে বলেছে, ''এই তিন বছরে আমার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে— শহরকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছি।''[৬] এখানে বন্যপ্রকৃতি সত্যচরণের মনে এত প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তার মনে হচ্ছে বন্যপ্রকৃতি তার চোখে মায়া রূপ কাজল পরিয়ে দিয়েছে। ফলে তার দৃষ্টি শুধু লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতির ওপর নিবদ্ধ।

আমাদের প্রমথ দত্তের চোখের কাজল আরও গাঢ়। এজন্য হয়তো লেখক মহিষের চোখের কাজল বলেছেন। কারণ মহিষের গায়ের রঙ এমনিতেই কালো। তাহলে চোখের নীচের রঙ কতটা

গাঢ় হলে তাকে কাজল হিসাবে স্বতন্ত্র চিহ্নিত করা যেতে পারে। তৎকালীন কলকাতা নগরের সমাজ-বাস্তবতা তার চোখে এই মায়া রূপ কাজল লাগিয়ে দিয়েছে। এই সমাজ-বাস্তবতার কদর্যতা, লুকানো ক্ষত, হারিয়ে যেতে বসা বিশ্বাস, মূল্যবোধ, নিজের ভেতরে চলা দ্বন্দ্বের যন্ত্রণা চোখের কাজলকে আরও অন্ধকার করে তোলে। আবার নিজের জৈবিক চাহিদা মেটানোর নেশায় তার চোখ লাল হয়। এই নেশায় মাতোয়ারা হয়ে যখন সে সমস্ত কিছু দেখে তখন সেগুলো নেশার বস্তুই মনে হয়, তাই সব লালচে। তা পাওয়ার উদগ্র বাসনায় শুয়োরের মত সমস্ত পাঁক ঘেটে সে ঘোঁত ঘোঁত করে এগোয়। থলথলে সমাজের এই স্থবিরতায় প্রমথ সুগন্ধ পায় না বলেই তার কাজলে মাছের আঁসটে গন্ধ। এতকিছুর পরেও প্রমথ দত্তের মনে ক্ষীণ আশা কাজ করে যায়। তাই সে মেয়েদের বুকের কাপড় সরিয়ে একখানি গ্রাম্য শস্যভূমি বা ওই জাতীয় সতেজ, জীবন্ত, নবীন কিছু দেখার আশা করে। সে সাজানো প্রেমে নয়, ভালোবাসায় পড়তে চায়।

বিভিন্ন সম্পর্কের মিথ্যার ক্লেদ গায়ে মাখে বলেই হয়তো সে সর্বক্ষণ বিবেকের দ্বারা দংশিত হয়। লেখক জানাচ্ছেন, ''খুব সাবধানে সে মনের মধ্যে একটা সাপ পোষে। সাপটা অন্য কাউকে কামড়ায় না। নিজেকে অষ্টপ্রহর কামড়াচ্ছে। নীল আরও নীল করে দিচ্ছে।''[৭] এই সাপকে এখানে আমরা যৌনতার প্রতীক হিসাবে ধরতে পারি। প্রমথ নিজের যৌনবাসনায় নিজেই দংশিত হয়। তারপরেও সে আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারে না। তার নিজের এক দাদা (তনু) আত্মহত্যা করেছিল। এই ঘটনার প্রভাব প্রমথর ওপর গভীরভাবে পড়েছিল। এই ঘটনা থেকেই সে বুঝতে পারে এই রাস্তা সমাধানের নয়। বেঁচে থাকার সহস্র প্রতিকূলতাই তাকে আরও বেশি করে জীবনমুখী করে তোলে। কারণ সে বুঝতে পারে, এই পৃথিবী থেকে একবার চলে গেলে ফিরে আসার কোনও পথ নেই। সিনেমার মতো কোনও 'রি-টেক' নেবার সুযোগ এই বাস্তব পৃথিবীতে থাকে না। ইচ্ছে করে এখান থেকে চলে যাওয়া যায় কিন্তু ইচ্ছে করলেই ফিরে আসা যায় না। আর প্রথম অনেক দিন বাঁচতে চায়। প্রথম ছদ্মবেশের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রকৃত স্বরূপে বাঁচতে চায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মানুষের ইচ্ছাশক্তির ওপর খুব জোর দেন। এই ইচ্ছাশক্তিই জীবনের বিপুল রহস্যের স্বাদ নিতে উন্মুখ করে তোলে মানুষকে। তখন ক্রমাগত খনন কখনও ক্লান্ত করে ফেলে না মানুষকে।

অক্লান্ত খনন প্রমথ দত্তকে সন্ধান দেয় বন্ধু নীতিশের শ্যালিকা বীথির। নিম্নবিত্ত পরিবারের পিতৃহীন মেয়ে বীথি। জামাইবাবুর সাহায্যে ও দাদার সংসারে সে বড় হয়ে উঠেছে। নিজের পরিবারের সমস্যা ও নিজের সমস্যা মিলে তার ব্যক্তিত্বকে যেন আরও সুদৃঢ় করে তুলেছে। এজন্য হয়তো সমাজের

পঙ্কিলতার মধ্যে থেকেও নিজের গায়ে কখনও পাঁক লাগতে দেয়নি। এই বীথি প্রথম প্রমথর ছদ্মবেশের সুতোতে টান ধরায় তার আচরণে, স্বভাবে কিংবা ব্যক্তিত্ব দিয়ে। প্রমথ অনুভব করে সে যেন হেরে যাচ্ছে কোথাও। এই হেরে যাওয়াটা আসলে প্রমথ যে ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল; সেটার পরাজয়, যে সাপটা সে মনের মধ্যে পোষে, তার পরাজয়। এই পরাজয় প্রমথের মনে একটা জোরালো ধাক্কা হিসাবে কাজ করে। প্রথমকে নিজের ভাবনা-চিন্তার গতানুগতিক প্রমথকে পরিত্যাগ করাতে বাধ্য করে এই পরাজয়। প্রথম কোনও ভালোলাগার নারী (বীথি) সম্পর্কে প্রমথের মনে হয়, সেই নারী (বীথি) নিজের মতো করে নিজের জায়গায় ভালো থাকুক। তাই বীথির সঙ্গে তার যে সম্পর্ক হয়, সেটা প্রেমের নয়, ভালোবাসার। আর সত্যিকারের ভালোবাসার স্বাদই তাকে ছদ্মবেশ ছেড়ে বেরিয়ে আসার শক্তি জোগায়। তাই তার বীথির কাছে যাবার ইচ্ছে হয়। প্রমথের অনেক সুপ্ত ইচ্ছাগুলোর মধ্যে শক্তির সঞ্চার ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে আসার ইচ্ছা।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে দেখেছেন জীবনের সবকিছু নিয়ে। লৌকিক ভাব সাহিত্যে পরিবেশিত হলে তা রসে পরিণত হয়। এই রস সর্বদা আনন্দদায়ক। অনেকটা এই রকম ভাবে লেখকও মনে করেন জীবনের প্রতিকূলতা, নেতিবাচকতা, সংগ্রাম শেষপর্যন্ত রস-ই উদ্‌গীরণ করে। এই রসাস্বাদনের ইচ্ছাই প্রমথকে জীবনের পথে আবর্তিত করে। উদ্ভিদ যেমন যে মাটিতে বা জায়গায় অঙ্কুরিত হয়, সেই মাটি বা জায়গা থেকেই (যতই শুষ্ক হোক না কেন) খাদ্যরস শুষে নিয়ে বেঁচে থাকে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা সেরকম প্রাপ্ত জীবন, পরিস্থিতি স্বীকার করেই জীবনের স্বাদ চেটেপুটে নিতে চায়। প্রমথর স্বগত উচ্চারণ, ''কোনও নতুন জায়গা বোধ হয় নেই। অন্য কোনো গঙ্গাও নেই। যে পথেই ঘুরি না কেন, কলকাতা ঠিক পেছনে আছে— অন্যদিকে যায় না।''[৮]

লড়াইয়ের প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই হচ্ছিলো। এবার সময় হয়েছে কৃত্রিম পোষাকটার (ছদ্মবেশ) মোহ কাটিয়ে জীবনের উলঙ্গ সত্যের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়ানো। জমাট বাঁধা মোহ গলতে সময় লাগে। তবু মানুষের ইচ্ছা অনুসারে প্রথম পদক্ষেপ নেওয়া সব সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রমথ প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণে সফলতা লাভ করে। প্রমথের ইচ্ছা শক্তির জোর আমরা অনুভব করতে পারি। সে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বীথির সামনে (বিয়ের পর) নিজের কামবাসনা, লোভ ইত্যাদি উলঙ্গ করে তুলে ধরে। এভাবে যদি আবার নতুন করে শুরু করা যায়, পাঁক-লাগা শরীরটা, কাজলে মাছের আঁসটে গন্ধটা মুছে ফেলে যদি নতুন মানুষ হওয়া যায়। এক্ষেত্রে বীথিও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু লেখক জানেন, মানুষ সামাজিক জীব হয়েও শেষপর্যন্ত সে একা। লড়াইটা প্রমথকে একাই করতে

হবে। কারণ, ''তখন এসব পাতানো সম্পর্কের মধ্যে হিসেব না মিটলে কেউ কারও না। কথাগুলো কী সত্যি— কী দয়ামায়াশূন্য।''[৯] এই লড়াই যেন বীথির সঙ্গেও। নতুন জীবনে নতুন পাতানো সম্পর্কে নতুন করে যেন কোনো ছদ্মবেশ তৈরি না হয় কিংবা বলা যেতে পারে অজ্ঞাতবাস ছেড়ে এসে আবার কোনো যেন অজ্ঞাতবাসে যেতে না হয়।

জীবনে এই চলার পথে যদি মৃত্যু আসে— সেটাও নিছক আসার জন্য আসা। আসাটা নেহাতই অনিবার্য, নাহলে ''মৃত্যুটা প্রায় থিয়েটার টিকিট। ভিড় দেখলে কিংবা সময় না থাকলে বেঁচে দেওয়ার মত নিশ্চিন্ত ব্যাপার।''[১০] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা সব সময় কোনও এক আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। আর মনে হয় এই আবিষ্কারের নেশাই তাদেরকে জীবনের পথে ধরে রাখে। কিসের আবিষ্কার? আমাদের এই ছকে বাঁধা গতানুগতিক জীবন-প্রবাহে বেঁচে থাকার স্বাদ। যে স্বাদের ভাগ ইচ্ছে থাকলেও অন্য কাউকে দেওয়া যায় না। কারণ তা ব্যক্তির নিজস্ব উপলব্ধি। এই উপলব্ধ অনুভূতিই মানুষকে শত প্রতিকূলতা, নিশ্চিত পরাজয়কে অস্বীকার করতে শেখায়। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসে আমরা তাই দেখি।

অনিলের স্বল্প আয়ের নিশ্চয়তা থাকলেও পরিবারে প্রতিকূল পরিস্থিতি তাকে মানসিকভাবে বিপন্ন করে তোলে। তার পরিবারের এই আর্থিক চাহিদা ভোগ-বিলাসের জন্য নয়, অসুস্থতার জন্য। বাবার অসুখ, মায়ের পাথুরি রোগের অস্ত্রোপচার সফল না হওয়া এবং নিজের বউ পুতুলের মাঝে মাঝেই অসুস্থ হওয়া; পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘদিনের এই শারীরিক অসুস্থতা— অনিলের মানসিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উপন্যাসের সূচনাটাও ইঙ্গিতবহ। অনিলের সবচেয়ে বড় মাসি তরঙ্গিনীর আসন্ন মৃত্যু সম্ভাবনার খবর দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে মৃত্যু, অসুখ, ডাক্তার, ওষুধ নিয়ে লেখকের সৃজিত বাস্তবে আমরা প্রবেশ করি।

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অনিল রায়চৌধুরী। তার একদিকে যেমন সামান্য রোজগার, অন্যদিকে তেমন অসুখের ক্রমশ থিতু হওয়া; অনিলের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার উপর আস্তরণ ফেলে দেয়। এই আস্তরণ ভয়ের। অনিল এই আস্তরণ গায়ে ফেলেই যেন প্রাত্যহিক জীবনে চলাফেরা করে। এই ভয় সৃষ্টি হয়েছে অসুখ থেকে, যা ক্রমে সম্প্রসারিত হয়ে মৃত্যুভয়ে গিয়ে ঠেকেছে। তাই পুতুল যখন অনিলের এত ভয় পাবার কারণ জিজ্ঞেস করে তখন অনিলের উত্তর, ''ভয় কি সাধে হয়। সব বুঝিয়ে বলাও যায় না... মোট কথা পৃথিবীটা খুব অনুকূল জায়গা না নিশ্চয়। এখানে পথ, ট্রাম লাইন, শিব মন্দির, বটগাছ তবু বেশিদিন টেকে— কিন্তু অনিল, নরেশ, সেজোর দম ফুরোলেই শেষ— আর সে

দমও গভর্নর দিয়ে লরির স্পিড বেঁধে দেওয়ার মতো— লিমিডেট।”[১১]

ভয়ের ভিতরে সে এমনভাবে সেঁধিয়ে গেছে যে, নিজের মধ্যে কল্পিত রোগের উপস্থিতি অনুভব করে। আসলে অসুখ-জীর্ণ পরিবারে থাকতে থাকতে তার চিন্তা-ভাবনাও অসুখের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। নিজের অসুখ না থাকাটাই অনিলের কাছে অস্বাভাবিক। পুতুলকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে এসে ভাবে, সেও একদিন না একদিন কোনও একটা রোগে চিরকালের মত তলিয়ে যাবে। ডাক্তারের কাছেও আসতে পারবে না। লেখকও অনিলের বয়স বাড়ার উপমা দেন শারীরিক অসুস্থতার (জ্বর) সঙ্গে তুলনা করে। অফিস ফেরৎ ক্লান্ত অনিল আরাম পায় এভাবে, ‘‘অসুখ বিসুখ, টাটানো ব্যথায় মলম দিয়ে কেমন করে আরাম পেতে হয় এসব নিয়ে কথা বলতে অনিলের আজকাল ভালো লাগে। জ্বর, ব্যথা, পোড়া ঘার জন্য ট্যাবলেট মিকশ্চার ইনজেকশন আছে জেনেই কেমন নিশ্চিন্ত লাগ।”[১২]

বাস্তব বা কল্পিত অসুখের ঘোরে চলা অনিল বহু বছর বাদে কলেজের বন্ধু গুরুপদের সঙ্গে দেখা হলেও, সেই অসুখের ঘোর থেকে বেরোতে পারে না। তাই বন্ধুর সঙ্গে অনিলের কথোপকথনের পুরোটা জুড়ে থাকে অসুখের কথা— কেবল অসুখ। এই ঘোর সম্পর্কে খুব সতর্ক বা সচেতন না থাকলে অসুখের ঘোরই অনিলের মনের চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই অনিলের একসময় মনে হতে থাকে, জীবনে অসুখ ব্যতিত আর কোনও ঘটনাই যেন ঘটছে না। এই ঘটনা-বিরল বোধ অনিলের মধ্যে সৃষ্টি করে স্মৃতি-আকুলতা। স্মৃতি-আকুলতা যেন তাকে সাহায্য করে অসুখের ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে। অনিল বারবার ফিরে যেতে চায় তার বাল্য-কৈশোর পর্বে। সেই পর্বের চঞ্চলতার স্মৃতিতে অনেক বেশি আরাম অনুভব করে অনিল। তাই কোনও এক অদৃশ্য শক্তির কাছে তার প্রার্থনা, একবার ছোটবেলার সময়ে ফিরে গেলে যেন ধীর লয়ে সময় প্রবাহিত হয়। যাতে বড় বেলার বর্তমান সময়ে অনেক দেরিতে পৌঁছায় অনিল। বর্তমানের অসহনীয় বাস্তবতা থেকে এভাবেই সাময়িক মুক্তি পেতে চায় অনিল। তবে শুধুমাত্র অসুখ অনিলকে ক্লান্ত করে না। পুতুলের সঙ্গ তার জৈবিক চাহিদা মেটাতে পারে না। সুখী যৌনজীবন মানুষের অনেক সমস্যার চিন্তাকে লঘু করে দেয়। কিন্তু অনিল অনেক চেষ্টা করেও তা পায় না। এর পিছনেও অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে পুতুলের মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়া। ফলে বাস্তব বা কল্পিত অসুখ, ওষুধ, স্মৃতি-আকুলতা, দৈহিক ক্ষুধা, স্বল্প আয় ইত্যাদি অনিলকে ধীরে ধীরে আরও নিঃসঙ্গ করে তোলে।

অনিলের সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে, এর মূলে রয়েছে অর্থের অভাব

ও যৌন অতৃপ্তি। স্বল্প বেতনের চাকরি তাকে পরিবারের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিলেও পরিবার ও নিজের অন্যান্য চাহিদাগুলোকে সীমায়িত করে দিয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভাব-অনটনই অনিলকে এত ভীতু করে তুলেছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আর্থিক চাহিদার সঙ্গে অর্থ জোগানের এই অসামঞ্জস্যতা অনিলের সমস্যাগুলোর অন্যতম কারণ। এই কারণ কিছুটা লঘু হতে পারত সুখী যৌনজীবনে। এক্ষেত্রে পুতুলের অসুস্থতা, সারাদিন অসুস্থ মানুষদের পরিচর্যা, সংসারের পরিশ্রম পুতুলকেও ক্লান্ত করে তোলে। ফলে পুতুল সেভাবে কোনও দিন সহযোগী হয়ে উঠতে পারে না অনিলের যৌনজীবনে বা তার বিপন্নতায়। অনিলের অর্থচিন্তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো—

ক. ''... কিন্তু মোলায়েম রাখবার জন্যে যে পরিমাণ টাকা থাকা দরকার তা না থাকলে মন খুঁত খুঁত করে। ... কিন্তু আমাদের যে আরও তিরিশ বছর থাকতে হবে। এতদিন থাকবার মতো পয়সা দরকার। পয়সা নেই বলে অর্থচিন্তা, মনঃকষ্ট-দুশ্চিন্তা।'' [অনিলের পুতুল, পৃ. ২০৪]

খ. ''শরীরের যে ফাঁক দিয়ে মৃত্যু ঢুকে পড়তে পারে সেখানে দশটা ডাক্তার আর আট বস্তা রুপোর টাকা ঢাল করে ফেলে রাখলে ঢুকবার আগে অন্তত কিছুদিন আশেপাশে ঘুর ঘুর করবে মৃত্যু, ইতস্তত করবে।'' [অনিলের পুতুল, পৃ. ২৩৫]

কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা হার মানতে শেখেনি। প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়, তারা ভালোভাবেই জানে। আর এই প্রতিরোধ আসে জীবনকে আঁকড়ে ধরার বাসনা থেকেই। প্রতিরোধ-কৌশল বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্ন রকম হয়। যেমন, অনিলের দাদা নৃপেনের কৌশল হলো যে কোনও ধরনের বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরা এবং সেই বিশ্বাসের মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়া। এই বিশ্বাস অন্ধ বা চক্ষুষ্মান— যাইহোক্ না কেন, তাতে কোনো যায় আসে না। মোদ্দা কথা হলো, 'আঁকড়ে' ধরা। এই রকম ধর্মের উদাহরণ হিসাবে নৃপেন জানায়, 'টাকা জমাবার ধর্ম', 'পরনিন্দা-পরচর্চার ধর্ম' ইত্যাদি। কিন্তু অনিল জেনে গেছে, আসলে প্রত্যেক বিশ্বাসই অন্ধ। তাই অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভর করে জীবন অতিবাহিত করা মানে জীবনের অনেক দিক সম্পর্কে অন্ধ হয়ে থাকা। এজন্য জীবনের অনেক দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নয়, জীবনের অনেক দিকে মুখ করেই অনিল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। জীবনের অনন্য স্বাদ চেটেপুটে নেবার জন্য অনিল পুনরায় প্রস্তুতি নেয় লড়াই করবার। আর যাদের রসাস্বাদনের ক্ষমতা রয়েছে, তারা লড়াই থেকেও রস শুষে নিতে পারে। অসুখের ঘোর থেকে বেরোবার জন্য অনিল নিজের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাকেই হাতিয়ার করে তোলে। এই হাতিয়ারগুলোকে শানিত করে তোলে এই ভাবে, ''সব দেনা যদি শোধ হয়ে যায়— সব অসুখ

লক্ষ্য করে তাহলে বাছাই বাছাই ইঞ্জেকসন, ট্যাবলেট ছুঁড়ে মারবে। তারপর একদম নিরাময় হয়ে গেলে ফলের রস, মিছরির সরবত, মাখন, মাংস, ঘুম, আদ্দির পাঞ্জাবি এবং ডাবের জল। একেবারে পয়লা নম্বরের সজল, সরস শরীর হয়ে যাবে।

তখন অনিল, পুতুল সেজো প্রথম থেকে আরম্ভ করবে!"[১৩] এই রকম ইতিবাচক মানসিকতাই শেষপর্যন্ত অনিলকে পুতুলের গর্ভের সন্তান নষ্ট করতে দেয় না। পুনরায় উদ্যোগ নেয় মায়ের অসুখ নির্মূল করার।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসের কাহিনির প্রধান চরিত্র নির্বাচিত হয়েছে ছাপোষা একান্নবর্তী নিম্নমধ্যবিত্ত ঘর থেকে। লেখকের নিজস্ব পারিবারিক জীবন হয়তো এই বিষয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই এই চরিত্রগুলো যেমন বিশ্বাসযোগ্য, জীবন্ত হতে পেরেছে তেমনি এই চরিত্রগুলোই প্রধান হয়ে উঠেছে লেখকের জীবনদৃষ্টি প্রকাশে। 'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসে কুবের এই রকম একটি চরিত্র। উপন্যাসের কাহিনিতে দেখা যায়, এক বাড়িতে দীর্ঘকাল চাপাচাপি, গাদাগাদি করে থাকতে থাকতে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল আর একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকবার। কারণ দেবেন্দ্রলাল ঘরে এসে বসতেই তার সব ছেলে একে একে চাকরিতে ঢুকেছে এবং সবাই বিয়ে করেছে। তবে এই প্রয়োজনীয়তা দেবেন্দ্রেলালের সব ছেলের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি অনুভব করে, তিনি হলেন কুবের। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে আর একটু ভালোভাবে থাকবার প্রয়োজনীয়তা কুবেরের কাছে হয়ে ওঠে সাধ-স্বপ্ন।

প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সামর্থ্য । তাই সামান্য কয়েক কাঠা জমি কেনার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতে হয় কুবেরকে। অবশ্য পছন্দমত জায়গা কিনতে না পারলেও জমি-জায়গা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয় কুবেরের মগজে ঢুকে যাচ্ছিল। এই জানার পরিধি ও গভীরতা যত বাড়তে থাকে কুবের তত ডুবে যেতে থাকে বিষয়ের পরিধি ও গভীরে। জীবন ও জগতের অন্যান্য বিষয়গুলো ক্রমশ মনোযোগ হারাতে থাকে কুবেরের কাছে। এই বিষয়ে প্রাথমিক সংশয় তার মধ্যেও ছিল। সে যেন একটু খানি হাত-পা ছড়িয়ে ভালো থাকবার জায়গা কিনতে গিয়ে চোরাবালির মত বিষয়-আশয়ে নিমজ্জিত হচ্ছে। এই সংশয়ী মন নিয়েই দল বেঁধে (টাকার জন্য) কুবের প্রথম জমিটা (এক একর চব্বিশ শতক) কেনে। প্রথম কোনও জমির মালিক হবার তৃপ্তিই তার মন থেকে ধীরে ধীরে সংশয় কাটাতে শুরু করে। জমির ওপর দখলদারি ও জমির মালিকানা কুবেরকে ততদিনে মানসিক জিহ্বায় অন্য এক জগতের স্বাদ এনে দিয়েছে।

এই স্বাদ তাকে আরও বেশি করে জমি কেনাবেচার বিষয়ে ঢুকিয়ে দেয়। এই স্বাদই তাকে বুঝিয়েছে এতে কোনও অন্যায়-অপরাধ হয় না। কারণ আদিকাল থেকে মানুষ এভাবেই ব্যবসা করে আসছে। আর ব্যবসার সারসত্য হলো, কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করা। এই যুক্তি কুবেরকে জমি সম্পর্কিত ব্যবসায় পুরো মনোযোগ ও মস্তিষ্ক খাটাতে সাহায্য করে। ফলে জমি কেনাবেচার হাত ধরে ক্রমশ বাড়তে থাকে কুবেরের স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ও আর্থিক শক্তি (কাঁচা টাকা)। যে প্রয়োজনীয়তা (পরবর্তীতে সাধ-স্বপ্ন) অনুভব করে কুবের জমি কিনতে বেড়িয়েছিল, সেই প্রয়োজন এখন গৌণ। মানুষ চলার পথে এভাবেই অনেক প্রয়োজনের মুখ বুজিয়ে দেয়। আর একটি প্রয়োজনের অনুভবে লুকিয়ে থাকে বহু প্রয়োজনের সম্ভাবনা। তাই প্রয়োজন ক্রমশ তার শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে চলে। অনেকটা প্রাচীন বটগাছের মত। গাছের ডাল থেকে নামা ঝুড়িগুলোই ক্রমশ বটগাছে পরিণত হয়ে যায়। এজন্যই হয়তো বিষয়-আশয়ের প্রতি ক্রমবর্ধমান টান কুবের এড়াতে পারে না। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই বিষয়ে জীবনদৃষ্টি খুব স্পষ্ট, ''আসলে মানুষ একদিন জানতে পারে— পৃথিবী জায়গাটা খুব নিরাপদ নয়। মা-বাবা চিরকালের নয়। টাকা— খরচার জিনিস। ফুরিয়েও যায় একদিন।

তাই মানুষ বিষয়কে আশ্রয় করে। সেই থেকে— বিষয়-আশয়।''[১৪] উপন্যাসে কুবের ও তার বাবার (দেবেন্দ্রলাল) কথোপকথনে কুবেরের বক্তব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হতে দেখি, ''... কিন্তু যেদিন আর টাকা আসবে না কুবের— তখন? তখন তুমি কী করবে?'

'সেজন্যেই তো লোকে বিষয়-আশয় করে— খারাপ সময়ে বিষয় থাকলে আশ্রয়ের চিন্তা থাকে না। বিষয় মানুষকে দেখে— আশ্রয় দেয়।''[১৫]

আসলে এক অনিশ্চয়তা মানব সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই সঙ্গী। কালপ্রবাহে শুধু রঙ বদল হয় কিন্তু থেকে যায় অনিশ্চয়তা। তাই কুবেরের প্রয়োজনীয়তার সীমানা বৃদ্ধির পথকে অনিশ্চয়তা থেকে নিশ্চয়তা পাবার চেষ্টার পথ হিসাবে দেখতে পারি। একসময়ের ভ্যাগাবন্ড কুবের এখন ড্রিম মার্চেন্ট। এবেলা ওবেলা মানুষের কাছে বিষয়ের স্বপ্ন বিক্রি করে নিজের বিষয়-আশয় বাড়াতে থাকে। কিন্তু এই কুবেরই এই কাজ করতে করতে উপলব্ধি করে, লোভের জিনিস পাবার ক্ষেত্রে যত প্রতিকূলতা কমতে থাকে কিংবা লোভের দ্রব্য যত সহজলভ্য হতে থাকে সেই জিনিসের প্রতি লোভ তত কমতে থাকে। তারপর হয়তো একদম মরে যায়। তাই কুবের নিজের সন্তানের জিনিস নষ্ট করার প্রসঙ্গে বুলুকে বলে, ''খোকনকে ভালো জিনিস নষ্ট করতে দিয়ে যাও— তাহলে দামি জামা, ভালো খেলনা,

ছবির বইতে আর লোভ থাকবে না—"[১৬] এভাবেই অনেক লোভ কুবেরের মরে গেছে। যে কোনও মানুষের মরে যায়।

তাই হয়তো অন্য একটি লোভ কুবেরকে পুনরায় চাগিয়ে তোলে। এবার ড্রিম মার্চেন্ট কুবের থেকে চকদার কুবের হবার লোভ। ভদ্রেশ্বর এখানে শুধু অনুঘটকের কাজ করে। চকদার হবার লোভে কুবের তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপাবে, এটা প্রায় অনিবার্য ছিল। তাই মেদনমল্লর চরে কুবের প্রায় সব সঞ্চিত অর্থ ঢেলে দেয়। সেও প্রায় পাকাপাকি ঘাটি গেড়ে বসে চরে। তার চোখে তখন একটা লোভই প্রতিনিয়ত দুলতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতি মানুষের ভাবনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সর্বদা চলে না। তাছাড়া সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল, প্রথম দিকে তার কাজের সঙ্গে যে আনন্দ বা বিস্ময় ছিল তা ধীরে ধীরে খসে পড়ছে। যে প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অর্থ উপার্জন শুরু করেছিল, মায়ের মৃত্যু সেখানে বড় ধাক্কা দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ভাইয়েদের কুবেরের তৈরি করা বাড়িতে না আসা, বাবার স্থায়ীভাবে না আসা; সূচনালগ্নের সেই প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে সমূলে কুঠারাঘাত করে। কিন্তু কুবেরের বিষয়-আশয়ের প্রতি লোভ তাকে বিষয়-আশয়ে নিমজ্জিত করে রাখে। মেদনমল্লের চরে আভা কুবেরের জীবনে এসে তার উদ্দেশ্যের ব্যর্থতা পুনরজ্জীবিত করে তোলে। এরপর প্রকৃতি তার লীলায় কুবেরের চকদার হবার লোভকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে যায়। অবশ্য এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটার আগে থেকেই কুবেরের বিষয়-আশয়ের প্রতি লোভের রস শুকিয়ে আসছিল, বিপর্যয় ঘটার পর চকদার হবার লোভে একেবারে ইতি পড়ে যায়।

কুবেরের একক ভাবেই নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটেছিল। উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটলেও পুরাতন বিশ্বাস, সংস্কার, মূল্যবোধ একেবারে ত্যাগ করতে পারেনি কুবের। সেটা পারাও সম্ভব ছিল না দু'টো কারণে। এক, পরিবার থেকে তার একক উত্তরণ ও সেরকম পারিবারিক সহায়তা না পাওয়া এবং দুই, উত্তরণের দ্রুতগতি। এই দু'টো কারণে তার ভেতরে বিশ্বাস, সংস্কার ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। কোনটাতেই স্থিত হতে না পেরে সে স্মৃতিভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়। মেদনমল্লের চড়ে কুবের নদীর চড়ের মতোই ভয়ঙ্কর একাকীত্বের শিকার হয়। এই মেদনমল্লের চড় তার একাকীত্বের প্রতীক হিসাবে উঠে আসে। বাহ্যিক জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ। কুবের অবশ্য এই নিঃসঙ্গতার জন্য নিজেকেই দায়ি করে। কারণ সে যে পথ বেছে নিয়েছে, সেখানে সিঃসঙ্গ হওয়া সংস্কারের দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত কুবেরের কাছে প্রায় অনিবার্য। শেষ বয়সে যে বিষয় তার আশ্রয় হবার কথা ছিল, তাই এখন বড় বোঝা হয়ে উঠেছে। কুবেরের প্রায় সব ইচ্ছা, সাধ, স্বপ্ন প্রকৃতি,

পরিস্থিতি, সময় ইত্যাদির চাপে ধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। এজন্যই হয়তো কুবের কদমপুরে পুনরায় ফিরে এসে পুরানো জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে না। তবে এই বিচ্ছিন্নতাই কুবেরকে তার অতীতের দিকে প্রবলবেগে টানতে থাকে।

তারপরেও সবকিছু হেরে গিয়ে হার মানে না কুবের। অতীতের পরিবারের বিস্ময়, আনন্দ তাকে জীবনের পথে ধরে রাখে। সেটাও যখন ভুলে যাচ্ছে, তখন আভার দৃষ্টিতে দেখা চাঁদের রহস্য তার অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে ওঠে। মইয়ের প্রায় শেষ কাঠিতে পা দিয়ে সে চাঁদের প্রকৃত স্বরূপ আবিষ্কার করে ফেলে। আক্ষেপ একটাই, তার এত বড় আবিষ্কার দেখার জন্য কেউ নেই, বলার মত কোনও লোক নেই। সাপের কামড়ে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে যেতে যেতেও তার এই আক্ষেপ আমাদেরকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ধান মজুত করার ঠিক মতো ব্যবস্থা না করার আক্ষেপ, নিজের মেয়ে কুসুমকে প্রয়োজনীয় সময় না দিতে পারার আক্ষেপ; জীবনের প্রতি আকণ্ঠ ভালোবাসকেই তুলে ধরে। সময়ের চাকায় সবকিছুই পিষ্ট হয় কিন্তু কিছু কিছু মানুষের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা-অতৃপ্তি- আক্ষেপ সেই রাস্তায় জীবনের শেষ রসটুকু পর্যন্ত নিঙড়ে নিতে থাকে।

''এই অনেকটা জুড়ে জলধারার নাম গঙ্গা। তাতে উল্টো সোজা টানের নাম জোয়ার ভাঁটা। ... আমি এসব লিখতে চাই।''[১৭] শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় এই কথা মনে আসার অনেকদিন (প্রায় তেইশ বছর) পর গঙ্গা নদী ও তার পার্শ্ববর্তী জীবনকে নিয়ে লেখেন উপন্যাস 'গঙ্গা একটি নদীর নাম' (২০০১)। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হাজরা হালদার। স্ত্রী, সাত মেয়ে ও এক ছেলে নিয়ে তার সংসার। মূলত সে দরিদ্র জেলে। গঙ্গা তার বিচরণ ভূমি। কিন্তু বার্ধক্য ও অর্থাভাব তার জেলে জীবনে বিরতি টেনে দেয়। মাসিক বারোশো টাকায় চাঁদ মহম্মদ মল্লিকের পোষা জীবদের দেখাশোনা করতে হয় হাজরা হালদারকে। জীবনের প্রান্তে এসে তার উপলব্ধি হয়, সে শুধু টিকে আছে। অর্থহীন এই বেঁচে থাকা। কোনও কিছুকে প্রবলভাবে আঁকড়ে ধরা চাই। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্ররা স্বপ্নকে সঙ্গী করেই জীবনের পথে চলে। পরিস্থিতির চাপ হাজরা হালদারের সেই স্বপ্নকে ক্রমাগত শুষে নিচ্ছিল। কিন্তু তারপরেও তো মানুষ লড়ে যায়। যেমন হাজরা হালদার নিভু নিভু স্বপ্নকে সযত্নে আগলে রাখে। কী স্বপ্ন তার? পুনরায় জেলে-জীবন ফিরে পাওয়া এবং জেলে হয়ে বড় গাঙে গিয়ে ইলিশ মাছ ধরা। এই স্বপ্নের পিছনে ইন্ধন হিসাবে কাজ করেছে যে বিষয়গুলো, সেই বিষয়গুলো হলো সংসারের আর্থিক অবস্থা ফেরানো কিংবা নিজের মেয়েদের ভালোভাবে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। আর একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, বড় গাঙে ইলিশ মাছ ধরার কৌলীন্য এবং চাঁদ হোসিয়ারি

থেকে মুক্তি পাবার স্বাদও এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

'স্বপ্ন' এই একটি শব্দের সঙ্গে মিশে রয়েছে মানুষের বিভিন্ন রকমের অনুভূতি। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশিরভাগ উপন্যাসে স্বপ্নের প্রবল উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু কেন? আমাদের মনে হয় লেখকের দৃষ্টিতে একটা জীবন স্বপ্ন ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই জীবন, জীবনের লড়াইয়ের কথা বলতে গিয়ে সঙ্গী হয় স্বপ্ন। আর এই সঙ্গীই জীবনের চলার পথে অনুপ্রেরণা, তাদিগ হয়ে ওঠে। এজন্যই হয়তো বয়স থাবা বসানো শরীর নিয়েও হাজরা হালদার প্রস্তুতি নেয় বড় গাঙে গিয়ে ইলিশ মাছ ধরার।

এজন্যই হয়তো হাজরা হালদার যখন দেখে নৌকার খোল ভরে উঠছে ইলিশে তখন স্বপ্নের ঘোরে তলিয়ে যেতে থাকে সে। প্রচুর অর্থ উপার্জন যদি একমাত্র উদ্দেশ্য হত, তাহলে হয়তো তাড়া থাকত ফিরে গিয়ে মাছ বিক্রি করার। এই তাড়া ছিল তার সঙ্গী মুকুন্দ পালের। কিন্তু ভুটভুটিতে মাছ ধরার অনভিজ্ঞতা হাজরাকে আছড়ে ফেলে বাস্তবের মাটিতে। স্বপ্ন ও বাস্তবের এই দ্বন্দ্ব শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাস্তব পরিস্থিতির চাপে নিজের হাতে ধরা মাছ (ইলিশ) নিজেকেই ফেলতে হয় নদীতে। হাজরা হালদারের স্বপ্নের করুণ পরিণতি এভাবেই ঘটে। হেরে গিয়েও হার না মানা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের চরিত্রগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই মুকুন্দর কাছে নিজের মেয়ের সঙ্গে চাঁদ মহম্মদ মল্লিকের ছেলের সম্পর্কের কথা যখন শোনে তখন আরও একবার সুযোগ পাবার সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকেই যেন হাজরা হালদার চমকে ওঠে না। বরং মুকুন্দ প্রদত্ত তথ্য অব্যবহিত পরেই হাজরা তাদের বাস্তব অবস্থাকে যেন অস্বীকার করে পুনর্বার ইলিশ ধরার স্বপ্নে বা ঘোরে নিমজ্জিত হবার প্রস্তুতি নিতে থাকে।

কোনও মানুষের কোনও কিছু করার ইচ্ছা, ভোগ করার ইচ্ছা যদি মরে যায়, তাহলে সেই মানুষের যাপনচিত্র কীরকম হবে? বা তার সামাজিক-সাংসারিক সম্পর্কের লেখচিত্রই বা কীরকম হবে? কিংবা সবকিছু অগ্রাহ্য করে শেষপর্যন্ত জীবনের পথেই আবর্তিত হওয়া শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলোর যে প্রধান বৈশিষ্ট্য— তা আমরা উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন চরিত্রের মধ্যেও দেখতে পাব কি না? এই সব প্রশ্নচিহ্ন নিয়ে আমরা দেখা পাই 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র খগেন নস্করের। সাংসারিক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে 'নিষ্কর্মা' চরিত্র বলা যেতেই পারে। স্ত্রী বেস্পতি আর দুই ছেলে পৃথক খায়। শুধু ছোট ছেলে ঘটি কখনও বাপের সঙ্গে ঘোরে, খায় কখনও বা মায়ের কাছে এসে পাত পাড়ে। তবে 'সৎলোক' হিসাবে এ অঞ্চলে খগেনের পরিচিতি রয়েছে। তাই পায়ের

পাতা বাঁকা বলে জমির কাজে ডাক না পড়লেও ভদ্দর লোকের বাড়িতে বিভিন্ন কাজে পাহারা দেবার ডাক পড়ে। আর খালের মাছ, গাছের ফল-রস খেয়েই খগেনের দিন চলে যায়। নিষ্কর্মা খগেনের কিছু গুণও রয়েছে। সে গাছ চেনে, গাছের শেকড়-বাকড় চেনে, তন্ত্রসাধনাও কয়েকদিন করেছে— এছাড়া সর্পবিদ্যা তার নখদর্পণে।

গুনিন হয়ে হয়তো অনেক কিছুই করতে পারতো অর্থাৎ অর্থ উপার্জন কিন্তু খগেনের আজকাল আর ইচ্ছা হয় না। এই ইচ্ছার মৃত্যু তাকে ধীরে ধীরে নিষ্কর্মা বানিয়েছে। স্ত্রী-পুত্র থেকে দূরত্ব বাড়িয়েছে। সমাজ তাকে 'সৎ লোকে'র ট্যাগ লাগালেও পরিবার-সংসারের প্রতি তার টান কমে গেছে। এমনকি যুবক বয়সের নিঃসন্তান অল্পবয়সি মাইতি-বেধবার ভালোবাসা গতজন্মের ঘটনা হিসাবে খগেনের স্মৃতিতে স্থান পেয়েছে। তবে সমাজ-সংসারের প্রতি দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলেও প্রকৃতির প্রতি তার দৃষ্টি সাধারণের থেকে হয়েছে আরও তীক্ষ্ণ, অনুভব শক্তি হয়েছে আরও জোরালো। জীবনের এই যাত্রাপথে তার সঙ্গে দেখা হয় শহর থেকে এসে গ্রামে বাড়ি করা বিপিনবাবুর সঙ্গে। হয়তো এই পরিচয়ের ফলেই খগেন সচেতন হয়ে ওঠে তার প্রতি পরিবারের লোকজনের রয়েছে গভীর অশ্রদ্ধা। তাই সমাধানের আশায় সে বিপিনবাবুকে জানায় নিজের অসহায়তার কথা। কীভাবে সে পয়সা উপার্জন করতে পারবে— সেই কৌশল বের করার দায়িত্ব অর্পণ করে বিপিনবাবু কাঁধে। বিপিনবাবুর বুদ্ধির ওপর নির্ভর করেই খগেনের মধ্যে জেগে ওঠে নিজের টাকায় সাধ মিটিয়ে হাউস করার ইচ্ছা।

আর খগেনের এই জেগে ওঠা ইচ্ছাকে কাজে লাগায় বিপিনবাবুর মত মানুষেরা যারা শুধু বাঁচার জন্য কাজ বানায়— যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে লোভ, মুনাফা। এরপর আমরা দেখতে পাই, বিপিনবাবুর লোভ, মুনাফার জালে খগেনের ক্রমশ জড়িয়ে পড়ার ঘটনা। প্রথমে গোসাপ তরপর বিষধর সাপ ধরতে থাকে খগেন। এই কাজের মাঝেই দেখা হয় শিবানীর সঙ্গে। মাইতি-বেধবা সুমতির যে ভালোবাসা গতজন্মের ঘটনাতে পরিণত হয়েছিল— তা যেন শিবানীর মধ্য দিয়ে খগেনের কাছে বর্তমান বাস্তবতায় স্থান পায়। এজন্যই হয়তো খগেনের মধ্যে বিপিনবাবু নির্মিত জাল থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা দেখতে পাই না। যে কাজে খগেন নেমেছে, তাতে তার নীতি, বিবেকের সঙ্গে আপোশ করতে হয়েছে। কারণ এরফলেই সে বুঝতে পেরেছে অনেকদিনের জমানো ইচ্ছেগুলো আবার ডানা মেলতে শুরু করেছে। যে ইচ্ছা-মৃত্যুর ফলে খগেন রেল লাইনে গলা দিয়ে আত্মহত্যা করতে যায়, সেই খগেন এখন দু'মাস ধরে ধরার জন্য মাদি কেউটের পেছনে ঘোরে। এখানে অর্থ উপার্জন একেবারেই গৌণ বিষয় খগেনের কাছে, মুখ্য হয়ে উঠেছে জীবনকে আরও একবার চেখে দেখার ইচ্ছা। শ্যামল

গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলো এখানেই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। লেখক নিজেই এই চরিত্র সম্পর্কে জানায়, ''ইচ্ছে মরে গিয়ে সে কোনও বড় বাণী দেয়নি। শোষণ, অভাব, খিদে, লড়াই তো সম্রাট অশোকেরও আগের আমলের জিনিস। মানুষের ইতিহাসের নিত্যসঙ্গী। তাকে বাদ দিয়ে খগেন চলতে চায়নি। তাকে নিয়েও পড়ে থাকতে চায়নি। বরং জীবন-রহস্যে কে যেন আসেনি— এই কথাটা জানতে পেরে মাদি কেউটেকে ছেড়ে দেয়। শিবানী, সুমতি, মেছুনি— সব একাকার করে ফেলে।''[১৮]

আমাদের আলোচ্য পরবর্তী উপন্যাস 'চন্দনেশ্বর জংশন' -এর প্রধান চরিত্র এই খগেন নস্করের ছেলে বজ্রেশ্বর নস্কর। আগের উপন্যাসে এই বজরার জীবিকার যে পরিচয় পাই, তা এই উপন্যাসেও বর্তমান রয়েছে। বারোখানা ডাকাতির মামলা তার নামে এখনও ঝুলছে আলিপুর আদালতে। আর রেলের ওয়াগন ভাঙতেও তার জুড়ি মেলা ভার। এমনকি অন্যের স্ত্রীকে ভাঙিয়ে আনা অন্যদিকে প্রথম স্ত্রীর জন্য ফলিডল দিয়ে আলুর চপখানা ভিজিয়ে রাখা তারই কাজ। এত গুণের অধিকারী বজ্রেশ্বর ওরফে বজরাকে 'সৎ' করে নিতে চায় তার দাদা হৃদয় নস্কর ওরফে রিদে। তাই বারবার সে বজরাকে সৎ হবার কথা বলে। হৃদয় শুধু এককভাবে নয়, সকলে মিলে বজরাকে সৎ করে নিতে চায়। সৎ হবার বিষয়টি হৃদয়ের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কিন্তু বজরার মনে হয়, তারা তো কোনও দিনই খারাপ ছিল না। বজরা নিজের জীবনচর্যায় ভালো-খারাপের মানদণ্ড দাদা হৃদয়ের থেকে পৃথক। কারণ বজরার ভাবনা অনুযায়ী, তার দাদা হৃদয় ভালো কিন্তু বোকা এবং নিজে ভালো কিন্তু চালাক।

লেখক এই উপন্যাসে বজরা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে এক গ্রাম্য সমাজ-বিরোধী মানুষের ছবি তুলে ধরেছেন। যাকে গ্রামের অন্যান্য শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা মিলে 'সৎ' করে নিতে চায়। যে দলের নেতৃত্বে থাকে হৃদয় নস্কর। এটা শুধু বজরাকে ভয় পেয়ে নয়, আসলে মানুষ সব সময় নিজেদের দল ভারী করতে ভালোবাসে। তাই শুধু একটি গ্রাম নয়, আশে-পাশের আরও গ্রাম থেকে চাঁদা ওঠে বজরার জন্য। এজন্যই হয়তো যার কোনও টাকা দেবার সক্ষমতা নেই, সেও খড় দেবার জন্য রাজি থাকে। যাতে হৃদয় সেই খড় বিক্রি করে সেই টাকা বজরার সৎ হবার কাজে লাগাতে পারে। হৃদয় নস্করের ক্রমাগত এই প্রচেষ্টা বজরার হৃদয়ে কিছুটা হলেও ধাক্কা দেয়। আসলে প্রতিটি মানুষকে জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে নিজেদের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। তাই লেখকও জানান, ''এখানে নাদু, শশী, রাধিকে, হৃদয়, সনেকা, বজ্রেশ্বর, অনন্ত, জগা— সবাই পড়ন্ত অবস্থায় উথলে বাইরে পড়ে যাওয়ার মুখে নিজেকে দেখতে পায়।''[১৯]

আমাদের আলোচ্য প্রধান চরিত্র বজরাই তার জীবিকার কঠিন পর্যায়ে পড়ন্ত অবস্থায় নিজের মুখোমুখি দাঁড়ায়। মজা নদীর ধারে বড় বড় পাথরের সঙ্গে বজরার কথোপকথন তো আসলে নিজের বিবেকের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়া। এখানেই সে উপলব্ধি করে যত কঠিন পরিস্থিতিই আসুক না কেন, সময় সবর্দা বয়ে চলে। জীবন যেভাবেই হোক সে প্রস্ফুটিত-বিকশিত হবেই। কারণ শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনদৃষ্টি হলো, ''জীবনের এক এক জায়গা দিয়ে আবার জীবন শুরু হয়ে যায়। মানে জীবন থেকে একটা জীবন বেরিয়ে আসে।''[২০] বজরা চরিত্রের মধ্যে লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গিই প্রতিফলিত হতে দেখি। তবে আর একটি জীবন হয়ে বেরিয়ে আসা বজরার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এত অপরাধের পঙ্কে সে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো যে একটা জোর ধাক্কার প্রয়োজন ছিল। আর সেই ধাক্কাটা এলো তার দাদা হৃদয় নস্করের কাছ থেকেই যখন দাদাকে বজরা ভেবে রেল পুলিশ প্রায় মেরেই ফেলেছিল। হৃদয় ও বজরা— দু'জনেই সেদিন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিল। হৃদয়ের এক পায়ে আসে পঙ্গুত্ব অন্যদিকে বজরার মনে আসে সেই প্রয়োজনীয় জোরালো ধাক্কাটা। এখান থেকেই শুরু হয় বজরার জীবনে প্রকৃত লড়াই। কঠিন পরিস্থিতি থেকে পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানো, জীবনের নগ্ন বাস্তবতাকে স্বীকার করেই আর একটি জীবনকে বের করে আনা জীবনের দিকে মুখ রেখে— শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই জীবনদৃষ্টি তার চরিত্রদের পুষ্ট করেছে। কাহিনির একেবারে শেষে বজরার নিজস্ব অপরাধের স্বীকারোক্তি বজরাকে আর একটি জীবনের পথেই পা বাড়াতে সাহায্য করে।

হয়তো পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মধ্যেই সৃজনশীলতা থাকে সুপ্ত অবস্থায়। সময়ের এগিয়ে চলার মধ্য দিয়ে কেউ সেটা উপলব্ধি করতে পারে কেউ বা পারে না। আবার যারা পারে তাদের মধ্যে কেউ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে না। কিন্তু শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের প্রধান চরিত্ররা শুধু সৃজনশীলতা উপলব্ধি করতে পেরেছে তাই নয়— তারা সৃজনশীলতা প্রকাশের নানাবিধ ক্ষেত্র বেছে নিয়ে তার নির্যাস 'আনন্দ'-এর রসাস্বাদন করতে পেয়েছে। তাদের এই যাত্রাপথের অন্তিমে পার্থিব জগতের সাফল্য বা ব্যর্থতা গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ সৃজনশীল মানুষ শেষপর্যন্ত মানবসভ্যতাকেই সমৃদ্ধ করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের অনাথবন্ধু বসু এমনই একটি চরিত্র যার মাধ্যমে লেখকের এই বিশিষ্ট জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

মফস্বল জনপদ ঈশ্বরীতলায় নিজস্ব বাড়ি তৈরি করে নানাবিধ পোষ্য নিয়ে ভালোই দিন কাটছিল অনাথবাবুর। ঘন্টাখানেকের কম সময়ে পৌঁছে যেত কলকাতার অফিসে। ঈশ্বরীতলায় বসবাসকালে অনাথবাবুর প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে দেখা ও অনুভব করার দৃষ্টিশক্তি ও মন নির্মিত হয়েছে।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

ক. ''কোথাও কোনো নাগরিক জিনিসের ছায়া পর্যন্ত দেখতে পেল না অনাথ। আজ পূর্ণিমা হতে পারে। চন্দনেশ্বর মৌজা পেরিয়ে দূরের ধোঁয়াটে জায়গার ওপরকার আকাশে এরই ভেতর চাঁদের একটা আউটলাইন ফুটে উঠল ।ভালো জ্যোৎস্না পেলে ঈশ্বরীতলার এদিকটা একদম বুনোপরী হয়ে যায়।" [ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, পৃ. ২০]

খ. ''এখানে সে বাতাসের ভেতর আলো দেখতে পায়। রোজ ভোরবেলা উঠে পরিষ্কার বুঝতে পারে— এখন তার খরচের জন্য সামনে টাটকা, আনকোরা একটা পুরা দিন পড়ে আছে। রোজকার ভোরবেলার সূর্যের আলো তার নতুন লাগে। এইভাবে কত কোটি বছর ধরে দিন আসে সকালবেলা। তার মাঝখানে এই সংসার করা আসলে একটা নিরর্থক খেলা।" [ঈশ্বরীতলার রূপোকথা, পৃ. ৩৩]

নিজের বিভিন্ন রকম পোষ্যদের সঙ্গে অনাথবন্ধু বসুর বার্তালাপ চলে। মনুষ্যতর প্রাণীরা তার সঙ্গে মানুষের ভাষায় কথা বলে আর অনাথবন্ধু তাদের সঙ্গে মনুষ্যতর প্রাণীর ভাষায় কথা বলে। যেমন— ''অনাথ দেখল, এখন সারা পৃথিবী ঘুমোচ্ছে। সে অনায়াসে চেঁচিয়ে বলল, কঁ কঁ কঁ।

মুরগিরা শুনল, দিন কোথায়! যাও শুয়ে পড়গে তোমরা। শুনেই ওরা ঘুমোতে চলে গেল ভেতরে।"[২১]

এই বিষয়টিকে আমরা দেখতে পারি সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সমব্যথী দৃষ্টিকোণ থেকে। আসলে অনাথবন্ধু নিজের স্বতন্ত্র মনুষ্যসত্তাকে অস্বীকার করেছে এখানে। প্রকৃতিকে দেখার জন্য যেমন সে নতুন চোখ আবিষ্কার করেছে তেমনি স্বতন্ত্র শ্রেণিসত্তাকে একীভূত করে ফেলেছে মনুষ্যতর প্রাণীদের সঙ্গে। তাই সহজেই অনাথবন্ধু নিজেকে তার বাড়ির সবচেয়ে 'বড় জন্তু' হিসাবে দেখে। যদিও বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে অনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গির মিল নেই। কারণ এই বিষয়টি মানুষের ভেতর তখনই জন্ম নিতে পারে যখন তীব্র সহমর্মিতা-সহানুভূতির সৃষ্টি হয়। আর এই সৃষ্টির পেছনে থাকে এই জগৎ-সংসারকে দেখার বিশেষ দৃষ্টিকোণ— যা অনাথবন্ধু লাভ করেছিল ঈশ্বরীতলায় বসবাস করে। একেই হয়তো বলে প্রকৃতির সঙ্গে পৃথিবীর সঙ্গে লীন হয়ে থাকা।

এভাবে ভালোই দিন কাটছিল তার। কিন্তু আর এক ধরনের আনন্দের সন্ধান দেন মহম্মদ বাজিকর। নিজের মতো করে কিছু তৈরি করার আনন্দ। শুধু আনন্দ পাবার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিছু তৈরি করার কাজে নিজেকে জড়ানো যায়, তাহলে তার স্বাদ বেঁচে থাকার আনন্দে কয়েকগুণ

বাড়িয়ে দেয়। বাজিকরের দেখানো পথ অনুসরণ করে শুরু হয়ে যায় অনাথের বিশাল কর্মযজ্ঞ। বর্ষায় চাষের পর জলের অভাবে কোম্পানি বাঁধ লাগোয়া বিভিন্ন মানুষের প্রায় তিনশো বিঘার মত জমি পতিত থাকে। নিজস্ব কিছু তৈরি করার আনন্দ পেতে সমবায়িক প্রথায় শুরু হয় ধান চাষ। ঈশ্বরীতলার সমাজের মাথারা ভেবে কুল পায় না এতে অনাথবাবুর লাভ কোথায়? ঐহিক সমাজের লাভ ক্ষতির অঙ্কে ডুবে থাকা মানুষদের পক্ষে অনাথবাবুর এই কর্মদ্যোগ, উৎসাহের তল পাওয়া প্রায় অসম্ভব। কারণ এই জগৎ-সংসারকে দেখার যে দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছেন অনাথবন্ধু— সেটার নিরিখেই আনন্দ রসের সন্ধান পাওয়া সম্ভব—

''তাই তো অবাক হচ্ছি। তুমি করছ কেন? কোনো লাভ নেই যখন? শুধুই বেগার খাটুনি? ধানচারা রোজ বড় হচ্ছে। তার শব্দ শুনতে পাই। যারা হাল দিল, রুয়ে দিল— তাদের ঘামে-ভেজা মুখের হাসিতে আমি মেঘ, বাতাস, জ্যোৎস্নার জলছাপ দেখতে পাই।''[২২]

কিন্তু পৃথিবীর অন্তরের কথা মনে হয় বিনিময়। বিনিময় প্রথার নিয়মেই এত বড় জগৎ-সংসার তার অস্তিত্ব রক্ষা করে আছে। কিছু পাওয়ার মধ্যে যেমন অনেক না-পাওয়ার গল্প থাকে, তেমনি না-পাওয়ার মধ্যেও অনেক কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা লুকিয়ে থকে। কোনও কিছুই একতরফাভাবে দীর্ঘদিন চলতে পারে না। অনাথবন্ধু বসু এই কর্মপ্রক্রিয়ার মধ্যে থেকে প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে লীন হয়ে যতটুকু রসাস্বাদন করেছেন— এবার সময় এসেছে কিছু দেবার। তা নেবার জন্যই প্রকৃতির প্রতিনিধি হিসাবে হাজির হয় মাজরা পোকা। তবে শুধু মাজরা পোকা নয় চাষের শেষের দিকে আরও নানান প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, যেমন— পাম্প দিয়ে জল না আসা, বাড়ি-জমি ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রেখে আরও টাকা জোগাড় করে চার ইঞ্চির ডায়ামিটারের পাইপ বসিয়েও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না ওঠা এবং শেষপর্যন্ত আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামা। ধান হলো বটে, তবে তাকে শুধু ভবিষ্যতের খড় বলা যেতে পারে। জলের তোড়ে ভেসে যায় অরুণ, বরুণ রাজহাঁস দু'টো। এই বিনিময় প্রথা বুঝতে পেরেই হয়তো অনাথ তার স্ত্রী শান্তাকে জানায়, ''কোনও জিনিস বিনে পয়সায় পাওয়া যায় না শান্তা! পাতালের ভেতর থেকে শেকড় রস টেনে আনে। সেই শেকড়ের ভেতরকার খবর কতটুকু রাখি? এখন বুঝি, আমি তো এতদিন কিছুই জানতাম না। আমার চারদিকে এখন রসস্থ জগৎ। সব দরজা খুলেছে শান্তা।''[২৩] আর অনাথ জানে, এই রসস্থ জগৎ দেখার জন্য বিনিময় প্রথাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে হবে। তাহলেই দেখার চোখ পাওয়া যাবে। এই জীবনদৃষ্টি নিয়ে শ্যামলের জগৎ গড়ে উঠেছে। তাঁর প্রধান চরিত্রদের আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির ফসল বলতেই পারি। তাই তারা পার্থিব লোকসান

হবে জেনেও কাজ থামিয়ে দিতে পারে না। কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গির লাভ-ক্ষতি শেষপর্যন্ত তাদের কাছে গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই হার নিশ্চিত জেনেও নিজের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার জন্য লড়ে যায়। লেখকের এই বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি প্রতিফলতি হয় অনাথের বক্তব্যে, ''হেরে গেলাম তাতে কি? আমি কত জিনিস দেখলাম। দেখতে দেখতে এগোচ্ছি। এখন আমি ভূগোল বইয়ের ঋতুকে প্রহর ধরে ধরে চিনি।

আসলে শেষ অব্দি থাকে কি? থাকে তো এই মানুষটা। এই আমি। আমার দেখা। আমার তেষ্টা। আমার কষ্ট। আমার সুখ।''[২৪]

শ্যামলের চরিত্ররা তাই আত্মহত্যা করে না— তারা সর্বস্ব খুইয়েও জীবনের পথেই আবর্তিত হয়।

'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসে এক পৃথিবী স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করে গ্রুপ থিয়েটারের একটি দল, যার নাম 'পঞ্চমুখ'। বিষয়বৈচিত্র্যে, অভিনব উপস্থাপনা কৌশলে, ভালো অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করা, তাদের স্মৃতিতে নিজের ও দলের আসন স্থায়ী করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু সাধারণত লিটিল ম্যাগের মত গ্রুপ থিয়েটারও তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই অর্থনৈতিক প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করে। যদিও এই সব বিষয় জ্ঞাত থাকার পরেও বিভিন্ন বয়সী মানুষ সৃজনশীল উন্মাদনায় গ্রুপ তৈরি করে স্বাধীনভাবে স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভালো নাটক করার জন্য। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে অমিয়র নাটক করার পিছনে মানসিক-অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়ে সর্বদা পাশে দাঁড়িয়েছে তার স্ত্রী লীলা। অমিয়র জীবনে ও সংসারে লীলার এই অবদান অবশ্য কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে অমিয়। তাই অমিয় মনে করে, লীলার মত স্ত্রী পাওয়া তার কাছে ভাগ্যের ব্যাপার। যে স্ত্রী (লীলা) তার গায়ের শেষ সোনাটুকু দিয়ে দিয়েছে অমিয়কে নাটক নামানোর খরচা তোলার জন্য। এরপরেও লীলার মনোভাব 'আরও থাকলে আরও দিতাম।' এভাবেই নিজের সামর্থ্যের শেষ রসটুকু নিঙড়ে দিয়েছে লীলা। কিন্তু অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও নির্দেশিত 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটকটি কাঙ্ক্ষিত দর্শক-গ্রহণযোগ্যতা লাভ করছিল না। অবশ্য এই নাটক করার মাঝখানেই অমিয় নতুন একটি নাটক রচনায় হাত দেয়। এক্ষেত্রে প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিলো নারীচরিত্র কেন্দ্রিক নাটক সুজাতার চরিত্রে অভিনয় করার মত উপযোগী অভিনেত্রী খুঁজে বের করা ও দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ ছিল তথাকথিত সেই অর্থ। 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' সেভাবে মঞ্চসফল না হওয়ার দরুণ দেনার ভারে নতুন নাটক নামানো প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু কিছু মানুষ থাকে যারা নিজেদের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার জন্য শেষপর্যন্ত লড়াই করে

যায়। অমিয় দিনের পর দিন প্রায় দর্শক শূন্য বা অল্প দর্শকের উপস্থিতিতেও নাটক চালিয়ে গেছে। মাথায় দেনার বোঝা নিয়ে 'সুজাতা'-র মত ভিন্নধর্মী নাটক লিখে গেছে। আর স্বপ্ন দেখেছে একের পর এক হাউসফুল নাইটে 'সুজাতা'র মত নাটক মঞ্চস্থ করতে। অমিয় স্বপ্ন দেখে 'সুজাতা' নাটকের উপার্জন থেকে হলঘরে এয়ারকুলার বসাতে পারবে। প্রতিদিন দর্শকের জন্য একস্ট্রা চেয়ার দেবার 'ঝামেলা' পোহানোর স্বপ্ন দেখে অমিয়।অবশ্য স্বল্প-পরিচিতিপ্রাপ্ত গ্রুপ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হিসাবে এই রকম স্বপ্ন দেখা সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে। তবে কিছু সিদ্ধান্ত সাধারণ গতানুগতিক ধারা থেকে কিছু মানুষকে আলাদা করে। ইতিহাস জুড়ে এর উদাহরণ ছড়িয়ে। সাধারণের চোখে এসব দুঃসাহসিক, পাগলামি কিংবা 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়' প্রবাদ বাক্যের মত। এই ধরনের সিদ্ধান্তই অমিয় চরিত্রকে বিশিষ্ট করে তুলেছে— লেখকের নিজস্ব জীবনদৃষ্টিতে স্নাত করেছে। উপন্যাসের কাহিনিতে এরকম একটি প্রথম সিদ্ধান্ত হলো, 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটকের প্রথম হাউসফুল নাইটেই সেই নাটকের লাস্ট নাইট হিসেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া। এর ইঙ্গিত লেখক আমাদের দেন যখন ভরা হলঘরে নাটক করতে গিয়েও অমিয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। আসলে অমিয় তখন মনের ভেতরেই প্রথম চ্যালেঞ্জের সমাধান করে ফেলেছিল। কিন্তু এই সমাধানটা ছিল তার তরফের— পুরোপুরি সমাধানের জন্য প্রয়োজন ছিল অন্যপক্ষের সম্মতি। এজন্যই হয়তো পুরো মন দিয়ে অভিনয় করা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে সে ফোকাসের বাইরে চলে যাচ্ছিল। আরও একবার ঝুঁকি নিয়ে দুর্গালালের গদি থেকে টাকা ও শ্রীরাম ট্রাস্টের হলঘর ভাড়া নিয়ে সুজাতার চরিত্রে রজনীকে রাজি করিয়ে অমিয় প্রবল আশা ও উদ্দীপনা নিয়ে এক অনিয়শ্চয়তার পথে পা বাড়ায়। রজনীও সাহায্য করে বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋন নিতে।

প্রত্যেক শিল্পীর মধ্যেই একটি অতৃপ্তি কাজ করে। আর এই অতৃপ্তি তাকে আরও ভালো কাজ করতে প্রেরণা জোগায়। অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও এই অতৃপ্তি অত্যন্ত সক্রিয় ছিল। তার জন্যই সে বারবার নাটক নিয়ে পরীক্ষায় মেতে উঠেছে। একুশ রজনীর পরেও 'সুজাতা' নাটক সেভাবে জমে না ওঠায় অমিয় প্রচার-কৌশল বদলায়— বিজ্ঞাপনের ভাষাও বদলে ফেলে। আর তাতেই ধীরে ধীরে হাউসফুল হতে শুরু করে 'সুজাতা' নাটক। থিয়েটার-দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন পড়ে যায় এই নাটক নিয়ে। সমস্ত দেনা শোধ হয়ে গিয়ে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারকে 'সুজাতা' নাটকের সাফল্য শক্তিশালী আর্থিক ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। এখন শুধু হলঘরে নয়, গ্রামে-গঞ্জের বিভিন্ন কল-শোয়ে অর্থ উপার্জন করতে শুরু করে 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটার। কোনও কোনও কাজ করে শিল্পীর মনে হয় এটা

তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ। ফলে এক ধরনের তৃপ্তি বাসা বাঁধে অমিয়র মনে। তাছাড়া গ্রুপ তৈরি হবার পর এই প্রথম কোনও নাটক তাদের এত বৃহৎ সংখ্যায় দর্শক-ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছে। এরফলে অমিয়র মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দ্বিধা, ''অমিয় পরিষ্কার জানে— সে এখন একটি প্রতিষ্ঠান। নতুন করে ভাবতে গেলে সব ভেঙে পড়বে। নতুন নাটকের ঝুঁকি নিতে কেউ রাজি হবে না। সবাই চায় নিরাপদে থাকি। বাড়ি ভাড়া রেশন হাউসফুল একস্ট্রা চেয়ার নিয়মিত পাবলিসিটি কলশো। কেউ চায় না, এই একই অভিয়ের একঘেয়েমি ভেঙে ফেলে দিয়ে আরও কঠিন কিছুর জন্যে প্রাণপাত করি।''[২৫] যদিও 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারে ভাঙনের সূত্রপাত অনেক আগেই হয়ে গিয়েছিলো। যখন অমিয় হাউসফুল হলের টিকিট সেলের নতুন আরামে ডুবে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত অর্থ প্রত্যাশায় শারীরিক অবস্থা উপেক্ষা করে গ্রামে-গঞ্জে নিয়মিত কলশো করে যাওয়া। এছাড়াও আমরা আর একটি কারণ খুঁজে পাই, আসলে অমিয় রজনীর সঙ্গে যথাক্রমে জীবন-সুজাতা চরিত্রে অভিনয় করার তৃপ্তিতে ডুবে ছিল। কারণ অমিয় অনুভব করেছে, তার ভেতরকার অভিনয়কে জাগিয়ে তুলতে পেরেছে একমাত্র রজনী। যার ফলে রজনীর অভিনয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অমিয়র অভিনয় আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। আর যে কোনও অভিনেতার কাছে এটা পরম গৌরবের বিষয়। তাই অমিয় তার স্ত্রী লীলার কাছে কৃতজ্ঞ থাকলেও রজনীর সঙ্গে অভিনয় করার, সঙ্গে থাকার সুযোগ লীলার অভিমান সত্ত্বেও হারাতে নারাজ।

অমিয় ক্রমশ বুঝতে পারছিল, সে শুধু এখন টাকা আয় করার যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ জীবন, মানুষ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। শিল্পীজনিত অতৃপ্তি এখন তার মধ্যে সেভাবে সক্রিয় নয়। অর্থ গ্রুপ থিয়েটারের পরিবেশ, মানসিকতা, আচরণ সব পাল্টে দিয়েছে। অমিয় ও তার গ্রুপ এমন একটি রাস্তায় হাঁটছে, যে পথের অর্থ উপার্জন ছাড়া আর কোনও দ্বিতীয় উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু অমিয়র ভেতরের শিল্পীসত্তা বর্তমান অমিয়কে বাস্তবতা আঙুল তুলে দেখায়—

''—তা হয় না অমিয়। জীবনযাপনের পদ্ধতিই মানুষের শিল্পে উঠে আসে। শিল্পের জন্য জীবনে শরীরের এক ইঞ্চি পোড়ালে তার ছাইটুকু শিল্পে উঠে আসে। এখানে সুদূর বোধি—কিংবা রিমোট সেন্সের কোনো দাম নেই অমিয়।''

—'তুমি কে?'

আয়নার অমিয় বলল, 'আমি তোমার আগেকার আমি।'

—'তাহলে আমি কে?'

—'তুমি হলে গিয়ে এখনকার আমি। তুমি পথভ্রান্ত পথিক।"[২৬]

নিজের শিল্পীসত্তা থেকে এভাবে দূরে সরে যেতে দেখে, অমিয় আরও একবার প্রস্তুত হয় অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে। কিন্তু 'ফেরিওয়ালার মৃত্যু' নাটক থেকে যত সহজে সে 'সুজাতা' নাটকে নামতে পেরেছিল— ততটাই কঠিন ছিল দর্শকধন্য বা মঞ্চজয়ী 'সুজাতা' নাটক গোটানো। আর তাছাড়া সাফল্যের সঙ্গে 'শত্রুতা' নামক এক সঙ্গী এসে জোটে। 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারের ক্ষেত্রেও সেটা ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে 'পঞ্চমুখ'-এর অতি সম্প্রসারণের সময়ে কিংবা সাফল্যের গর্ভে যে পতন বা ভাঙনের বীজ রোপিত হয়েছিল— অর্থ-সান্নিধ্য যে ঘটনাগুলোকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে রেখেছিলো; তাই ধীরে ধীরে বড় হয়ে সামনে আসতে শুরু করল। থিয়েটার ও রজনী-সান্নিধ্যে অমিয় এতটা সময় ব্যয় করছিল যে নিজের সন্তান-স্ত্রীর ভাগে দেওয়ার মত কোনও অবিশিষ্ট সময় ছিল না অমিয়র। বারবার কিছুটা সময়, নজর চেয়েও দীর্ঘদিন না পেতে পেতে এবং রজনীর সঙ্গে অমিয়র ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি, লীলার মত স্ত্রী-কেও অমিয়র থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অমিয় ভাবছে, ''লীলা যদি একটু বুঝত। কিংবা বেশি বোঝে বলেই হয়তো এত শক্ত হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। চালু নাটক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে এই যে, আরেক নাটক শুরু হয়ে গেলো পঞ্চমুখের জীবনে— যার প্রথম দৃশ্য শংকরের প্রস্থান, দ্বিতীয় দৃশ্য শোনা যায় শশাঙ্কর উদয়, তৃতীয় দৃশ্য সম্ভবত এই ট্যাক্সিযাত্রা দিয়েই শুরু। চতুর্থ দৃশ্য— ঝড়ের আভাস— লীলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাক মুখে।"[২৭]

নিজস্ব পারিবারিক বিপর্যয়, পঞ্চমুখের ভাঙা হাট, রজনীর নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে যাত্রা, গ্রুপের অন্যান্য সদস্যদের সেই উদ্দীপনা-উৎসাহ না থাকা, 'সিকিউরিটি' নামক চর্মরোগে গ্রুপের আক্রান্ত হওয়া, 'সুজাতা'-র মত মঞ্চসফল নাটকের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যাওয়া— এরপরেও অমিয় 'সম্রাট' নাটক নামানোর প্রস্তুতি শুরু করে। জাগিয়ে তোলে তার সেই পুরানো অতৃপ্তিবোধ, একেবারে ভিন্নধর্মী ('সুজাতা'র সাপেক্ষে) ঐতিহাসিক পিরিয়ডধর্মী নাটক 'সম্রাট' নিয়ে পুনরায় পরীক্ষায় মেতে ওঠা কতিপয় মানুষদের ক্ষেত্রেই সম্ভব। এই ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণই শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রগুলোকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। নিশ্চিত জীবন নয়— বরাবর অনিশ্চিত জীবনেই আনন্দ পেয়েছে, জীবনকে দেখতে-শিখতে- বুঝতে চেষ্টা করেছে, জীবনকে নিঙড়ে রসাস্বাদন করেছে। এই অনিশ্চয়তাই অমিয়কে পুনরায় জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করে। সে নিজের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষা পূরণে পুনরায় নতুন বিষয়ে ঝাঁপ দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এভাবেই কিছু মানুষ সাধারণের মধ্যে থেকেও সাধারণত্ব অতিক্রম করে। লেখকের এই বিশিষ্ট জীবন-দর্শন অমিয় চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখি।

কোনও সৃজনশীল মানুষ যখন মধ্যবয়সে এসে উপলব্ধি করে, তাকে আর্থিক সচ্ছলতা দিয়ে, কাজে ফাঁকি দেবার সুযোগ দিয়ে, নিরাপদ-নিশ্চিন্ত একটা জীবনের টোপ সামনে রেখে— আসলে কর্মক্ষেত্রে তাকে জড়ভরত কিংবা 'যো হুজুর' বানানোর প্রক্রিয়ায় ক্রীয়াশীল অনেকটা যেন সোনার খাঁচায় বন্দী পাখির মত স্বাধীনতা দিয়ে শান্ত রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য— সেই ব্যক্তি তার জীবনে কী ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে? শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্মিত চরিত্ররা সিদ্ধান্ত গ্রহণের বৈশিষ্ট্যেই স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণই নয়, গৃহিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই কাজে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ— অনিশ্চয়তা, পরাজয়, মৃত্যু কোনও কিছুকেই পরোয়া না করে লক্ষ্যে অবিচল থাকা, মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম; সেই সব মানুষকে একশো জনের ভিড়েও আলাদা করে চেনা যায়। লেখক জীবনকে দেখেছেন অফুরন্ত বিস্ময় ও অপরিসীম কৌতূহলের চোখে। এই পৃথিবীতে নিজের মত করে কিছু জিনিস বানাবার আনন্দই বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়। কুবের বা অনাথ বানাতে চেয়েছিল মফস্বল, গ্রাম বা দ্বীপের মধ্যে। 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে দিলীপ বসু তার জীবনের প্রথম পর্বে শহরে বসবাস করে এই বানাবার আনন্দে মশগুল হয়ে উঠতে চেয়েছেন। এই আনন্দ যারা অনুভব করতে পারে, তারা বারবার ভেঙে পড়েও বারবার উঠে দাঁড়ায় শুধু নিজের মত করে কিছু বানাবার আনন্দ পেতে। এক্ষেত্রে ভেঙে পড়াটাই যেন ইন্ধন জোগায় শরীর ও বুদ্ধিকে সচল করতে।

'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসের দিলীপ বসু তার কর্মজীবনের প্রথম পর্বে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেছিল। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি বেসরকারি কয়লা খননকারী কোম্পানীকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা ও ভারতবর্ষের অন্যতম বৃহৎ কোম্পানিতে পরিণত করা। দিলীপ বসু আরও কিছু তৎকালীন সময়ের প্রাণোচ্ছল যুবকদের সঙ্গে নিয়ে অনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কিছু বানানোর আনন্দে মশগুল হয়ে রাত-দিন কাজ করেছে। ন্যাশনালাইজেশন হবার পর কোম্পানির কর্মসংস্কৃতিতে বিপুল পরিবর্তন আসে। অনাথ চক্রবর্তী তো একরকম প্রায় বসে থেকেই বেতনসহ কোম্পানির সর্বোত্তম সুবিধা গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু যে মানুষের সৃজনশীলতায়, নতুন করে কিছু বানানোর উদ্দীপনায় শরীরের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসাড়তা ও ক্ষয়রোগ বাসা বাঁধে না, তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হয় কাজের ক্ষেত্রে বসিয়ে দেবার। কারণ একদা যারা প্রকৃত পরিশ্রম করে উপরে উঠে এসেছে— তাদের মধ্যে অনেকের কিছু বানানোর আনন্দের পরিবর্তে ক্ষমতা ভোগ করার আনন্দ সময়কালে অনেক বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে। বিনিময়ে তাদের সৃজনশীলতায় অসাড়তা ও মরচে ধরে। আর এই স্বাদের বিভাজন যত কম ভোগের আনন্দ তত বেশি। ফলে এই ধরনের মানুষদের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা বোধ ও ভীতি

কাজ করে তাদের প্রতি যারা এখনো বানানোর আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতে চায়; কি জানি কখন তাদের পাশে আর একটি চেয়ার যুক্ত হয়ে না যায়! এজন্যেই জীবনের মধ্য বয়সে এসে দিলীপ বসু উপলব্ধি করে, ''খারাপ লাগে এজন্যে যে, সামনে আর কোন বিস্ময় নেই। একই নিয়মে তাকে চাকরি করে যেতে হবে। এই পৃথিবীর পিঠের ওপর আমরা সবাই কেমন করে বেঁচে আছি— একথা ভাবলেই দিলীপের আরও খারাপ লাগে।''[২৮] ফাঁকি দাও আপত্তি নেই, কাজে অবহেলা করো তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু বেড়ে ওঠার সব রাস্তা বন্ধ। উদ্দীপনা-উদ্যমের সঙ্গে নতুন কিছু করা বারণ। তাহলেই পছন্দমত হয়ে থাকা যাবে, মোটা বেতনের চাকরির নিশ্চয়তার সুখনিদ্রায় বাকিটা জীবন যাবে কাটান।

কিন্তু দিলীপ বসু 'ফর গ্র্যান্টেড' হয়ে সারাজীবন বসে থাকবার মত পাত্র নয়। জীবনে যখন বিস্ময় কমে আসছে তখনও সে একটা সুযোগের অপেক্ষায় ওৎ পেতে বসেছিল। আর সেই সুযোগ আসল যখন ভৌমিক ট্রাস্টের হয়ে খাদান খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিলীপ বসু নিজেই সবচেয়ে কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেয়— সেটা হলো প্রাইভেটলি শেয়ার বিক্রি করা অর্থাৎ সোজা কথায় খাদানের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করা। আর তৎকালীন সময়ে একটা আনকোরা বেসরকারি অতি ক্ষুদ্র কোম্পানির জন্য যেটা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু প্রায় এক বছরের মধ্যে দিলীপ অচল একটি ক্ষুদ্র খাদানকে নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। পুঁজির অভাব তো হয়নি বরং এই পুঁজির দৌলতেই কয়লা উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গোকুলদার নজরে তাই দিলীপ বসু 'মিরাক্যাল ম্যান'। কিন্তু ঋষি, অনন্ত, গোকুল কেউই এই খাদানের সম্প্রসারণ চায় না। প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বার্থ এখানে কাজ করে। তবে খাদানের সম্প্রসারণের পক্ষে দিলীপ বসুরও নিজের স্বার্থ আছে। সে স্বাতীকে বলে, ''রাগ নয়। একটা অন্ধ কবন্ধ জিনিসকে আমি নাড়া দিতে চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে 'ফর গ্র্যান্টেড' ধরে নিয়েছিল। ভেবেছিল— দিলীপ বসুকে একটা টেবিল দিয়ে ডাম্প করে ফেলে রাখলেই চলবে। কিন্তু তা হয়নি। শুধু পাণ্ডবেশ্বর এরিয়াতেই ওদের বিজনেস ফল করেছে বিশ লাখ টাকার। ভালো করে এগোলে ওই অঙ্ক বিশ কোটি টাকায় দাঁড় করানো যেত। তখন টনক নড়তো। কিন্তু বাধা যে আমাদের নিজেদের ভেতরেই।''[২৯] দিলীপের এই স্বার্থকে আমরা দিনের পর দিন বিপুল সৃজনশীল কর্মক্ষমতার অপচয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। দিলীপের ভুল হয়েছিল এটাই যে, সে সহজ বিশ্বাসে কয়েকজনকে সঙ্গে করে এই প্রতিবাদ সংগঠিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু এই রকম কর্মক্ষম মানুষকে দেখে সাধারণত্বের সীমা অতিক্রম করতে না পারা মানুষদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধের সৃষ্টি হয়। ভয় হয় দিলীপের সঙ্গে থাকলে যে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তায় পা বাড়াতে

হবে— তাতে না তাদের এতোদিন ধরে সাজানো নিশ্চিত জীবনে ছেদ পড়ে। আসলে যে কৌতূহল, বিস্ময়, সৃজনশীলতা থাকলে জীবনকে নিবিড়ভাবে অনুভব করা যায়— তা তাদের মধ্যে নেই। কারণ কংক্রীটের জঙ্গলে থাকতে থাকতে মধ্যবিত্ত ভীরুতায় এক ছকে-বাঁধা জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ছকের বাইরে তারা মাঝে মধ্যে ট্যুর করতে রাজি কিন্তু প্রতি পদে পদে জীবনকে পরীক্ষায় ফেলে বাঁচার যে আনন্দ— তা করা তাদের ক্ষমতার বাইরে। ফলে নিজের দলের মধ্যেই বাধা পেয়ে দিলীপের মধ্যে তীব্র বিরক্তি ও হতাশার সৃষ্টি হয়। এমন একজন মানুষ যে বন্ধ্যা কাজের কমিশন পেয়ে কখনও খুশি থাকতে পারে না। কারণ দিলীপ বসু মানেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটে চলা, কাজের আনন্দে কাজ নিয়ে মেতে থাকা, বড় করার চ্যালেঞ্জ নিয়ে সমস্ত মনোযোগ সেই কাজে একত্রিত করা। তাই দেখা যায় কোল ইণ্ডিয়ার মত ভৌমিক খাদানও তার অপ্রতিরোধ্য গতিকে রুদ্ধ করতে চায়। দ্বিতীয়বার ভেঙে পড়তে দেখা যায় দিলীপ বসুকে।

বহমান গতিশীল নদী যেমন তার পথ বানিয়ে নেয়, দিলীপ বসুও তেমনি আরও একটি নতুন ক্ষেত্রে জড়িয়ে যায় এবং সেখানেও নতুন কিছু বানাবার আনন্দে মশগুল হয়ে ওঠে। লেখক জানায়, ''দিলীপ অনেকদিন পরে বানাবার জিনিস, বাড়াবার জিনিস— গ্রোথের ব্যাপার হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়ে মল্লিকবাজারের হর্ণের আওয়াজ, চেঁচামেচির ভেতর স্বপ্ন দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।''[৩০] পুরানো গাড়ি কিনে নিজের কল্পনাশক্তি দিয়ে নানান জিনিস অ্যাসেম্বল করে একটি নতুন রূপ দিয়ে কিছুদিন চালিয়ে সেটা বিক্রি করা। এই কাজ করতে গিয়ে সে কালু ঘোষের লাল অস্টিনট্যুরার গাড়িটা কেনে। তারপর কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে। দিলপী যে কোনও দিন গাড়ি চালায়নি— স্টিয়ারিং ধরামাত্র গাড়ি মসৃণভাবে চলতে থাকে। গাড়ির জ্বালানী পর্যন্ত খরচ হয় না। গাড়ির পেছনের সিটে মৃত কালু ঘোষের অদৃশ্য উপস্থিতি। অশরীরি কালু ঘোষের সঙ্গে শরীরি দিলীপ বসুর ঘনিষ্ট সম্পর্ক তৈরি হওয়া। তার সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া, ঘুরে বেড়ানো, গল্প করা ইত্যাদি চলে। এই ক্ষেত্রটিতে আমাদের বাস্তব-অবাস্তবের ধারণা কিছুটা গুলিয়ে যায়। তবে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তার অনেক উপন্যাসেই এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন যেখানে বাস্তব ঘটনাবলীর সাহায্যে বক্তব্য প্রকাশের অসুবিধায় সম্মুখীন হয়েছেন বা বক্তব্যের তীব্রতা প্রকাশে তৃপ্ত হতে পারেননি। অশরীরি কালু ঘোষকে নিয়ে দিলীপ বসুর সম্পর্ক দিলীপের নিঃসঙ্গতা, সমমানসিকতার বন্ধু পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত করে। আসলে জীবনের অনেকটা সময় ধরে দিলীপ যাদের বন্ধু ভেবে এসেছে— সেই ভাবনা শেষে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল। এটা সে আরও বেশি করে বুঝতে পারে তখন যখন একসঙ্গে মিলে ভৌমিক ট্রাস্টের খাদান করতে

নামে। শেয়ার সংগ্রহের কমিশন হাতে ধরিয়ে প্রথমেই তাকে কিছুটা দূরে ঠেলে দেওয়া হয়। ফলে খাদানের নানান সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে ঋষি, অনন্ত, গোকুলদের হাতে। তারপর কোল ইণ্ডিয়ার গুড বয় হিসাবে থাকার জন্য ঋষির অসহযোগিতা— যে বিশ্বাস নিয়ে দিলীপ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করছিল কোল ইণ্ডিয়াকে একটা লেসন দেবার জন্য, সেই বিশ্বাসেই ছুরিকাঘাত করা হয়, ''দিলীপ দেখলো অনেক কিছুই জানতে চাওয়া যায়। কিন্তু যেটাই চাইবে— সেটাই খানিক খানিক করে বিশ্বাসের পলেস্তারা তুলে দেবে। সে কথা উচ্চারণের পর কেউ কারো মুখে তাকাতে পারবো না। সে যে আরো কষ্টের। কেন যে খাদান করতে এসেছিলাম। কোন দরকার ছিলো না আমার। দিব্যি আমরা, বন্ধুরা ছিলাম। আসলে আমাদের এমন শক্তি নেই— যার জোরে এসব পার হয়েও আমরা বন্ধু থাকতে পারি।''[৩১] এভাবেই দিলীপ আরও নিঃসঙ্গ হতে থাকে। ঋষি, অনন্তর সঙ্গে আগের ধারণামতো বন্ধু হয়ে থাকার আকাঙ্ক্ষা দিলীপের মধ্যে সক্রিয় থাকে। কিন্তু বাস্তব ঘটনাবলীতে তা সম্ভব নয়। তাই বন্ধুত্ব পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই দিলীপের অবচেতন মন নির্মাণ করে অশরীরি কালু ঘোষকে। ভালোবাসা, মেশামেশি, বন্ধুত্ব নিয়ে কালু ঘোষের বয়ানে আসলে নিজের ভাবনাকেই তুলে ধরে দিলীপ। এতোদিন ধরে যাদের সে বন্ধু ভেবে এসেছে তারা দিলীপের এই ভাবনাগুলোর শরিক হতে পারে না। ফলে বন্ধুত্ব না পাবার যন্ত্রণা— আর সেই যন্ত্রণা থেকেই সমমনোভাবাপন্ন অশরীরি কালু ঘোষের আবির্ভূত হওয়া। তবে প্রশ্ন হলো কালু ঘোষই কেন? উপন্যাসে কালু ঘোষের যা ইতিহাস পাই, তাতে গ্রামের একটি সাধারণ ছেলে তার পরিশ্রম, মাথার ঘিলু, দূরদৃষ্টির সাহায্যে কলকাতায় নিজের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। যে মানুষ বানাবার আনন্দ অনুভব করতে পারে না, তার পক্ষে শুধু পরিশ্রম ও ভাগ্যের সাহায্যে এত দূর ওঠা সম্ভব নয়। ফলে কালু ঘোষের মানসিকতার সঙ্গে দিলীপ বসু অনেক বেশি একাত্ম হতে পেরেছে। কোল ইণ্ডিয়া অ্যাকাউন্টসে কাজ করতে গিয়ে এই ধরনের অনেক মানুষের সঙ্গেই ওঠাবসা করতে হয়েছে, তখনই হয়তো জীবিত কালু ঘোষের মানসিকতার প্রতি একটি সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি হয়েছিল যা কালক্রমে মনের অবচেতন অংশে স্থান পেয়েছিল। নিঃসঙ্গ-হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় যখন দিলীপের মধ্যে বন্ধু পাবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে তখন তার মনের অবচেতন অংশের উক্ত ধারণার দ্বারা আবির্ভূত হয় কালু ঘোষ। মজার ব্যাপার হলো, এই দু'জন মানুষেরই মৃত্যু হয় নকশাল বিপ্লবী রবির হাতে।

ইতোমধ্যে সহ্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় অনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে ঝামেলা, চাকরি থেকে সাসপেন্ড হওয়া, ঘটনাচক্রে হত্যার অপরাধে জড়িয়ে যাওয়া— পালানো-আত্মসমর্পণ-মামলা-

শেষে ডাক্তারের রিপোর্টের সাহায্যে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে জেল থেকে ছাড়া পাওয়া। অবশ্য ততোদিনে দিলীপ বসু চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছে। কিন্তু এই সব ঘটনাপ্রবাহ খুব বেশি আঘাত দিতে পারেনি দিলীপ বসুকে। দাম্পত্য একঘেয়েমি সত্ত্বেও সে তার পূর্বতন স্ত্রী রাণীর (বর্তমানে প্রবোধের স্ত্রী) কাছে ছুটে আসে একটু আশ্রয় পেতে। কিন্তু রাণীর গর্ভে প্রবোধের সন্তান, ফিরে আসার প্রস্তাবে রাণীর প্রত্যাখান ইত্যাদি দিলীপ বসুকে আর একবার ভেঙে পড়তে সাহায্য করে। এই ভাঙা মন নিয়েই অবশেষে সে হাজির হয় কালু ঘোষের জন্মভূমি গ্রামে। সঙ্গে রবির ছেলে খোকন। তিরিশ বছর সময়ের ব্যবধানে গ্রামের লোকেরা দিলীপ বসুকেই কালু ঘোষ বলে ধরে নেয়। কালু ঘোষের গ্রামের পরিবেশ, কালুর ভাঙা বসতবাড়ি , মজা পুকুর, আমবাগান, গ্রামের পতিত জমি ইত্যাদি দেখে দিলীপের মধ্যে আরও একবার জেগে ওঠে নিজের মত নতুন করে বানানোর তীব্র ইচ্ছা। বানানোর এই ইচ্ছাশক্তিই দিলীপ বসুকে পুনর্বার দাঁড় করাতে সাহায্য করে। এই পর্বে দিলীপ বসু হয়ে যায় একেবারে 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের অনাথবন্ধু বসু। কৃষিকাজে একেবারে জড়িয়ে পড়ে একদা এক নম্বর শহুরে দিলীপ বসু। যারা বানানোর আনন্দে মশগুল হয়ে থাকতে চায়, তাদের কাছে বিষয় বা ক্ষেত্র গৌণ। দিলীপ বসুই সেটার জ্বলন্ত উদাহরণ। ঘটনাপ্রবাহে দিলীপের নকশাল-বিপ্লবী ছেলে রবি হাজির হয় কালু ঘোষের গ্রামে। রবির মতে তার বাবাও একজন শ্রেণিশত্রু। আর শ্রেণিশত্রুদের খতম করাই তাদের (নকশাল- বিপ্লবীদের) কাজ। পিতা-পুত্রের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তা-ভাবনা নিয়ে বাদানুবাদ হয়। শেষপর্যন্ত রবির হাতে খুন হয় তার বাবা দিলীপ বসু। লেখক বিশ্বাস করেন, মানুষকে খুন করা যেতে পারে। কিন্তু মানুষের স্মৃতিকে কখনও খুন করা বা নিশ্চিহ্ন করা যায় না। স্মৃতিতে থেকে যায় মানুষের নানান চিন্তা-ভাবনা, সৃজনশীল খেয়াল ইত্যাদি। তাই এই মৃত্যু দিলীপের পরাজয় হিসাবে আসে না বরং সে যে বারবার ভেঙে পড়েও বারবার উঠে দাঁড়িয়েছে— নিজের স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার জন্য জীবনকেই বেছে নিয়েছেন, মানুষকে খতম করার পদ্ধতি গ্রহণ করেনি— এখানেই মানবসভ্যতার চাকায় যেন দিলীপ বসু নিজের অস্তিত্ব জাহির করেছে। সৃজনী কল্পনাশক্তির সাহায্যেই মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে অনাদিকাল থেকে। আর যেখানে ভূমিকা থাকে দিলীপ বসুর মত কিছু মানুষদের।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনকে দেখেছেন নানাভাবে। এই দেখতে চাওয়ার ইচ্ছেগুলোই ধরা দিয়েছে সাহিত্যে নানারূপে। আসলে জীবনকে ভেঙেচুরে দেখার নামই সাহিত্য। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও এরকম জীবনকে দেখি যেখানে কিছু কিছু চরিত্র জটিলতার মধ্যেও জীবনকে চালনা করেছে

শেষপর্যন্ত নিজের ইচ্ছার অদম্য সাহসে। যেখানে টিকে থাকার জন্য বেছে নিতে হয় অপ্রিয় কঠিন কিছু সিদ্ধান্ত। এমনই একটি চরিত্র 'শেষ বিকেলের আলো' উপন্যাসের নায়িকা রূপা। স্বামী সুশান্তের সঙ্গে সচ্ছলভাবে ছিল রূপা। তারপর ধীরে ধীরে সুশান্তর শারীরিক অবস্থার অবনতি এবং অকাল প্রয়াণ রূপাকে সম্মুখীন করালো অন্য এক বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে। বর্তমানে সে একজন যুবতী বিধবা ও এক সন্তানের মা। তাই বর্তমান অবস্থার চেয়েও 'কত বড় জীবন সামনে পড়ে আছে' এই নিয়েই এখন রূপা মা হিসাবে বেশি চিন্তিত। আসলে যেখানে নিজেদের অবস্থাই টালমাটাল সেখানে সহানুভূতির চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্ব পায় ভবিষ্যৎ-চিন্তা। রূপার জীবনে শুরু হয় অন্য এক লড়াই যা তার নিজের সঙ্গে, নিজেকে টিকিয়ে রাখতে। অসহায় অবস্থায় নিজের বাপের বাড়িতে ফিরে আসার পর তাকে তারই দাদার মুখে শুনতে হয় ''তোর হুট করে আসাটাই অন্যায় হয়েছে। কোম্পানি কলোনিতে থাকলে ওদের সেলসেই তোর একটা চাকরি হয়ে যেত।''[৩২] দাদার এ সুর তো যত্নের নয়, বরং দায়িত্ব এড়ানোর কিংবা অন্যের ঘাড়ে দায়িত্ব চাপানোর। তাই দেবর সনৎ-এর সামনে রূপার নিজেকে 'ভীষণ অপরিষ্কার লাগে'। কীভাবে দাদা নিমাইচাঁদ যুবতী বিধবা বোনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সনতের কোয়ার্টার-এ তাকে থাকার জন্য বলতে থাকে? কিন্তু এরপরও সামলে ওঠার নামই জীবন। সনতের রূপার প্রতি ভালোবাসা রূপাকে আরও অসহায় করে তোলে। তাই মনকে আরও শক্ত করে সে উপলব্ধি করলো, এই লড়াই তার একার। তাই নিজেকে নিজেরই উৎসাহ, প্রেরণা, সাহস ইত্যাদি জোগাতে হবে। এভাবেই আত্ম-অনুপ্রাণিত হবার কৌশল জীবনের প্রতিকূলতা গ্রহণে রূপার মনকে প্রস্তুত করে। এই জীবনে উঠে দাঁড়ানো যে কত কঠিন তা রূপা বুঝেছিল। কিন্তু মনের তীব্র সাহসে সে এগিয়ে চলে সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে। রূপা বেঁচে উঠতে চায় সমস্ত বন্ধনকে উপেক্ষা করে। তাই শেষপর্যন্ত সে বেছে নেয় ছেলেকে। জীবনে স্বামী না থাকলে কোনও মেয়ে যে অসহায় হয়ে যায় না, একথা সে বুঝিয়ে দেয় সনৎকে। বেঁচে থাকা মানে অবলম্বন নয়, টিকে থাকা নিজের স্বাধীনসত্তা নিয়ে। তাই সবার সমস্ত উপদেশ কিংবা আদেশকে উপেক্ষা করে রূপা বাঁচে, নিজে, নিজের মতো করে। সেখানে তার সন্তানের মা সে একা।

খ. উপন্যাসের গৌণ চরিত্র ও ঘটনা, প্রসঙ্গ অবলম্বনে জীবনদৃষ্টি:

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের জগতে প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি অপ্রধান বা গৌণ চরিত্রদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। আমরা এখানে গৌণ চরিত্র বলতে পাঠগত আধিপত্য বা

উপস্থিতির সাপেক্ষে মূল্যায়ন করেছি। মূল কাহিনিতে একটি চরিত্রের উপস্থিতি বা কার্যকলাপ অংশের নিরূপণ করে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র ব্যতিত অন্যান্য চরিত্রগুলোকে গৌণ চরিত্রের শ্রেণিগত বিভাগে রেখেছি। যেহেতু লেখকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোতে আত্মজৈবনিক উপাদানের ছড়াছড়ি, আর নায়ক-নায়িকা চরিত্রের মধ্যে লেখকের 'অল্টার ইগো'-র প্রকাশ লক্ষ্য করি; তাই প্রধান চরিত্র হিসাবে যেমন আমরা উপন্যাসের একমাত্র নায়ক বা নায়িকা চরিত্রে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি আলোচনা করেছি তেমনি এখানে গৌণ চরিত্র হিসাবে নায়ক চরিত্র ব্যতিত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করব যারা হয়তো উপন্যাসের শিল্পাঙ্গিক আলোচনায় প্রধান চরিত্র হিসাবে গণ্য হতেই পারে। এই সব চরিত্ররা কখনও নায়ক চরিত্রে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টিকে পরিপুষ্টি দান করেছেন কখনও বা স্বতন্ত্র জীবনদর্শনের আভাস আমাদের দিয়েছেন।

মানুষ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক লড়াই করে। 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে অবিনাশ চৌধুরীকেও লড়াই করতে হয়েছে। জীবনের প্রথমদিকে আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা ছিল তার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রায় সবদিক থেকে প্রতিষ্ঠা পাওয়া অবিনাশ জীবনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে এসে অনুভব করছে, ''আগে ভাবতাম জীবনে দাঁড়াতে পারব কী। হয়ত এখন পেরেছি। যশ, কিছু অর্থ, আকর্ষণীয় চেহেরা, ভদ্রস্থ কথাবার্তা সবই আয়ত্বে এসেছে। কিন্তু তারপর? এই জীবনের আকর্ষণ কোথায়? এখন সত্যি আমাকে গয়না বাঁধা দিতে যেতে হয় না। বি এ পড়তে ট্যুইশানি করেছি।''[৩৩] এই ধরনের মানুষেরা জীবনের মধ্যর্বতী পর্যায়ে এসে বেঁচে থাকার সেই আগেকার উদ্দীপনা, উৎসাহ, আকর্ষণ হারিয়ে বসে। আসলে জীবনের প্রথম পর্বে যে অপার বিস্ময়, কৌতূহল তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল— তা ক্রমশ বয়স, অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়। ফলে এক ধরনের উদ্দেশ্যহীনতা, কিছু ভালো না লাগার অনুভূতি ক্রীয়াশীল হয়। নায়ক চরিত্রের মত এরাও নিঃসঙ্গতায় ভোগে। কিন্তু নায়ক চরিত্ররা পুনরায় লড়াই করার বিষয় খুঁজে নেয় বা নতুন কিছু বানানোর আনন্দে মশগুল হয়ে ওঠে। বারবার ভেঙে পড়েও বারবার উঠে দাঁড়ায়। আর অবিনাশের মত মানুষেরা অনেক কিছু করার কথা ভাবলেও পুনরায় অনিশ্চয়তায় ঝাঁপ দিতে ভয় পায়। তাদের ভয় হয় এত দিনের অর্জিত সব কিছু হারাবার। তাই ওদের কাছে স্থবিরতা প্রার্থনীয়। অস্থিরতা, দোলাচলতা থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে। অবশ্য আত্মহত্যার ভাবনা মনে আসলেও তাকে বাস্তবে কার্যকর করতে যে সাহসের দরকার হয়, তাও তাদের মধ্যে থাকে না। আসলে এই জগতের প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে বেঁচে থাকার যে আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকে, অবিনাশ চৌধুরী তার ব্যতিক্রম নয়।

তাই কারেন্ট বন্ধ হবার ফলে যখন সে লিফ্‌টে আটকে যায় তখন তার মধ্যে মৃত্যুভয় জাগ্রত হয়, ''কিন্তু এ কোথায় এল? দুই তলার মাঝখানে। বিশাল অফিস-বাড়ির মেঝে কংক্রিটের গাঁথুনি। চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না। 'আমি অবিনাশ চৌধুরী এখানে মরে যাচ্ছি— আমায় তুলে বের কর তোমরা। আমি তোমাদের কনফিডেনসিয়াল লিখি।' এ কথা বললেও কেউ আসবে না। জানবেই না।''[৩৪] তার আগের দিন রাতের বেলায় সোনেরিলের ফাইল নিয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবে অবিনাশ। কিন্তু আমরা তো জানি—

''তবুও তো পেঁচা জাগে;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়— অনুমেয় উষ্ণ
অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের
স্রোত ভালোবাসে।''[৩৫]

স্থবিরতা প্রার্থনীয় হলেও, মৃত্যু-ভাবনা মনে এলেও বেঁচে থাকার প্রতি মানুষের যে আদিমতম অমোঘ অনিবার্য টান তা খুব কম মানুষ অস্বীকার করতে পারে। জীবনের এই সনাতন টানের কথাই অবিনাশ চরিত্রের মধ্যে পরিলক্ষিত হতে দেখি। অবিনাশ প্রেম করে লিলির সঙ্গে বিয়ে করেছে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লিলির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় অবিনাশের। কারণ দাম্পত্য সম্পর্কে বিস্ময়, কৌতূহল কমে যাওয়া। বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে জোরালো করে রাখতেই, সে যেন নীলিমার প্রতি জোর করে আকৃষ্ট হতে চায়। প্রমথ ও তার বন্ধুদের সঙ্গে মিশে নিজের মনের শূন্যতাকে কিছুটা ভরাট করতে চায়। আর নস্টালজিয়ায় ভোগা শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চরিত্রদের তো একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনের প্রতি বিস্ময়, টান কমে যাওয়া মানুষদের মধ্যেও যখন মৃত্যু-সম্ভাবনার ক্ষীণ-সূত্র জাগ্রত হয়— সেই মুহূর্তগুলো কেটে যাওয়ার পর চির পুরাতন এই পৃথিবীটাই ভালো লাগে। তাই অবিনাশের এতদিনের চেনা-পরিচিত নিত্য যাতায়াতে অভ্যস্ত অফিস পাড়াকেও সুন্দর লাগে। নিজের বেঁচে থাকার অস্তিত্বে আনন্দ অনুভব করে। আসলে লেখক যেন বলতে চেয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে জীবনের প্রতি বিস্ময়, টান, কৌতূহল

কখনও একেবারে শেষ হয়ে যায় না। তাই মানুষ যে কোনও পরিস্থিতিই হোক্ না কেন সে শেষপর্যন্ত বেঁচে থাকতে চায়। তাই কিছু হবে না জেনেও, কিছু ভালো লাগে না বল্লেও, এই পৃথিবীতে কেউ নিজের অস্তিত্ব কখনোই একেবারে শেষ করতে চায় না। এটাই যেন মানুষের অমোঘ নিয়তি, এটাই যেন পৃথিবীতে প্রাণের দাবি প্রতিষ্ঠা করা, এটাই যেন অনন্ত রহস্যের খনি পৃথিবী, প্রকৃতি, জীবন ও সময়ের মধ্যে ডুবে থেকে রসাস্বাদন করতে চাওয়া, জীবনকে বোঝার চেষ্টা করা। লেখকের এই জীবনদৃষ্টি প্রতিফিলিত হতে দেখি অবিনাশের মত চরিত্রের মধ্যে।

কতিপয় মানুষ আবার কিছু বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। যার মধ্যে তারা এই পৃথিবী থেকে একদিন সবকিছু ফেলে চলে যেতে হবে— এই অনিবার্য নিয়তির মধ্যে যে যন্ত্রণা, ভয়, হাহাকার, নিঃসীম শূন্যতা রয়েছে; তার মধ্যেও আশার আলো বপন করে। অনেকটা জীবন-মৃত্যুর ঘূর্ণায়মান সম্পর্কে ভিত্তিভূমি দেবার চেষ্টা। যেমন 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসে নেপেনদা অনিলকে বলেছে, ''খুব একটা অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নিম্নশ্রেণীর ধর্ম চাই আমাদের। যার মধ্যে ঢুকলে আর বেরোতে পারব না। কি বলিস তুই? তখন আর কোনও ভয়ই ঢুকবার পথ পাবে না, এই যেমন ধর টাকা জমাবার ধর্ম, পরনিন্দার ধর্ম, কিংবা যে-কোনও একটা অন্ধ বিশ্বাস, সে তুই যা-ইচ্ছে নাম দে—''[৩৬] এখানে নেপেন তার নিজস্ব ভাবনার কথাই তুলে ধরছে। যে কোনও ভাবে বেঁচে থাকার উদ্দীপনা, উৎসাহ জিইয়ে রাখার কৌশল হলো নেপেনের এই বিশ্বাস। নিজের মায়ের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে নেপেন একদিন বিকেলে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ খুলে বসে। বিবেকানন্দের বই নেপেনের অন্যতম প্রিয় গ্রন্থ। 'অনিলের পুতুল' উপন্যাসে নেপের কাহিনি দেখলে বোঝা যায় একসময় অনেক কিছু করে (পৃথিবী-বিখ্যাত বিভিন্ন হোটেলে কাজ করেছে) শেষ বয়সে জীবনের প্রতি সেই টান অনুভব করছিল না। অনেকটা অবিনাশের মত। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল কিছু করার— এক্ষেত্রে নেপেন একটি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে যা তাকে জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করেছে। আসলে মানুষ তার স্বভাব-চরিত্র-মানসিকতা অনুযায়ী শেষপর্যন্ত কিন্তু সেই জীবনের পথেই আবর্তিত হয়; এই জীবনদর্শনের স্পষ্ট প্রতিফলিত রূপ নেপেন।

'কুবেরের বিষয় আশয়' উপন্যাসের ব্রজ ফকির চরিত্র আমাদের এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে সহজেই আলোচনা করা যেতে পারত। কিন্তু সেই অংশে আমরা শুধুমাত্র নায়ক চরিত্রের ওপর আলোকপাত করেছি জন্য এই অংশে ব্রজ ফকিরের ওপর প্রতিফলিত জীবন-দর্শন আলোচনা করব। এই উপন্যাসে ব্রজ ফকির নায়ক চরিত্র কুবেরের ওপর প্রতিফলিত জীবন-দর্শনকেই পুষ্টি দান করেছে,

তবে ভিন্ন পথে গিয়ে। আর সেটা স্বাভাবিক, কারণ দু'জন স্বতন্ত্র মানুষ। ব্রজ ফকিরের পুরো নাম ব্রজ দত্ত। কাহিনির শুরু থেকেই আমরা তাকে অনিশ্চিত জীবন-যাপন কাটাতে দেখি। কুবেরের মুখে শুনি, ব্রজ দত্ত জায়গাজমি ছেড়ে এসে এই ধরনের ফকিরি জীবন বেছে নিয়েছে। তিনটে বিয়ে এবং পেটের ভাত জোগাড়ের জন্য নানান ধরনের ছোট-খাটো কাজ অনবরত করেছে। অবশ্য এই সব কাজের ভিত্তিভূমিতে রয়েছে ছল-চাতুরির কৌশল। বারবার বিয়েতে বসলেও নারীর প্রতি বিশেষ কোনও টান ব্রজ দত্তের মধ্যে দেখি না। এমনকি সন্তান-সংসার করার প্রতি বিশেষ কোনও আগ্রহ তার মধ্যে অনুভব করি না। বরং কুবেরের মত বারবার জীবনকে অনিশ্চয়তার মুখে ফেলতে ব্রজ দত্তের যেন জুড়ি নেই। এভাবেই যেন সে জীবনের রসাস্বাদন করতে পারছিল। ব্রজ ফকির কুবেরকে জানায়, ''তুই একজন কনটেমপোরারি আর্টিস্ট। সত্যি কী না বল? তুই এ-যুগে বাস করছিস— যুগের সঙ্গে জড়িয়ে আছিস— তোর এভরি রাইট আছে আর্টিস্ট বলে পরিচয় দেবার। ক'জন তোর আমার মাতো সাফার করছে বল? ক'জন তোর আমার মতো টাইমকে নিঙড়ে নিয়ে সেকেন্ড, মিনিট একটুও ফাঁকি না দিয়ে সব সময় ফিল করছে?''[৩৭] হ্যাঁ, সময় ও জীবন এভাবেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যারা সময়কে নিঙড়ে অনুভব করতে পারে, তারাই জীবনের প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারে। আর কুবের ও ব্রজ ফকির অনিশ্চিত সময়ের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে জীবনকে মুহূর্ত ধরে উপলব্ধি করেছে। তবে অনেক সময় আভার মত আমাদেরও মনে হয় ব্রজ দত্ত নিজেকে ছাড়া আর কাউকে ভালোবাসে না। কিন্তু এই বিষয়টি আর একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখব, এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ শেষপর্যন্ত নিজেকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। ফলে ব্রজ ফকিরের এই স্বার্থপরতাও কিন্তু জীবনের প্রতি ভালোবাসা থেকে জীবনের পথে আবর্তনকেই ইঙ্গিত করে। অবশ্য ব্রজ দত্ত তার জীবনের শেষ পর্বে একটি নিশ্চিত জীবনযাত্রাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। এখানেই কিছুটা পার্থক্যের সূচনা হয় কুবের ও ব্রজের জীবনযাত্রায়। একটি পাথরকে রেলেশ্বর শিব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে, তাকে কেন্দ্র করে মন্দির তৈরি করতে চেয়ে এবং নিজেই সেই মন্দিরের স্থায়ী সেবাইত হিসাবে একটা স্থির জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা আমরা ব্রজ দত্তের মধ্যে দেখতে পাই। এই পন্থা ব্রজ দত্তের পূর্বের গৃহীত জীবন-কৌশল থেকে পৃথক। হয়তো ব্রজ ফকির জীবনের শেষ পর্বে এসে জীবনের অনিশ্চিত যাত্রা থেকে সাময়িক বা স্থায়ী বিরতি চেয়েছিল। তবে এই পর্বেও নানান বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে। যেমন, সাহেব মিত্তিরের সঙ্গে বিরোধীতা, রেলেশ্বর শিব নামক পাথরটির হারিয়ে যাওয়া, আভার নিরুদ্দেশ হওয়া ইত্যাদি। তবু ব্রজ দত্ত ভেঙে পড়েনি। বরং একটি স্থায়ী নিশ্চিত জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষায় রেলেশ্বর

শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা হবেই, এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেছিল। তবে ব্রজ ফকির তার জীবনে যা কিছু করেছে তা একটি বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে না রাখতে পারলে, তার মস্তিষ্ক বিকারের সম্ভাবনা প্রবল ছিলো। আর এই রকম কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরাই আমাদের জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করে। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, যারা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়, তারাও তো এক ধরনের বিশ্বাসের ফলেই সেই পথ বেছে নেয়। এখানে কিন্তু আমরা 'আঁকড়ে ধরা' এই দু'টো শব্দের ওপর জোর দিচ্ছি। কারণ মনে হয় যারা আত্মহত্যাপ্রবণ হয় তারা কোনও রকম বিশ্বাসকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে পারে না। বা যখন তারা আত্মহত্যা করে, তখন আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছার উদ্‌ভাস তাদের মধ্যে ঘটে যা স্থায়ী আসন পাবার আগেই আত্মহত্যা সংঘটিত হয়। জীবনের প্রতি বিস্ময়, কৌতূহল কমে গেলে কখনও কখনও এই উদ্‌ভাস ঘটে। যেমন 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসে অবিনাশের ক্ষেত্রে হয়েছিল। কিন্তু কিছুটা সময় অতিক্রান্ত করলে, কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে পারলে আত্মহত্যার ইচ্ছার উদ্‌ভাস বিলীন হয়ে যেতে পারে। এই পৃথিবী অনন্ত রহস্যে, বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাই এই ধরনের কিছু মানুষও পৃথিবীতে বর্তমান। তাদের কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে না রাখতে পারার বিষয়টি লেখককে ভাবায়। তাই শ্যামলের ওপরের ভাই যখন কুড়ি বছর বয়সে পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করে— এই ঘটনা লেখককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ফলে লেখকের অনেক উপন্যাসেই এই ঘটনা রূপ বদলে হাজির হয়। শ্যামলের সৃষ্ট জগতে জীবনের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বৈচিত্র্যই প্রতিফলিত হয়। কারণ লেখকের জীবনদৃষ্টি জীবন-বৈচিত্র্যকেই প্রতিফলিত করে।

ব্রজ দত্তর মত 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে অনিল দত্ত একজন আত্মসুখপরায়ণ চরিত্র। আবার 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস' উপন্যাসের অবিনাশ চৌধুরী একদা কাজ-পাগল মানুষ ছিলেন। অবশ্য অনিল, অবিনাশ-এর মত চরিত্র যারা অনেক ক্ষেত্রেই নায়ক চরিত্র যার মধ্যে লেখকের 'অল্টার ইগো'র প্রতিফলন দেখতে পাই, সেই নায়ক চরিত্রের তারা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ভূমিকা পালন করেছে। যেমন, 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে অনিল দত্ত। কর্মজীবনের শেষের দিকে এসে তাদের মধ্যে যেন জড়তা বাসা বাঁধে। তারা জড়তাকে যুক্তিযুক্ত করতে চায় কোনও বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেই, ''জানো নিবারণ, জীবনটা একটা সার্কেল। যেখানে যা করবে— যেখানে যেটুকু পাপ হবে— তার রিটার্ন ঠিক সার্কেলের এক জায়গায় তোমার জন্য ওৎ পেতে বসে থাকবে।''[৩৮] এই ধরনের বিশ্বাসকে আমরা অন্ধবিশ্বাস বা যে কোনও ধরনের বিশ্বাস বলি না কেন, তা আমাদের জীবনের কর্মময়তাকেই ভিত্তিভূমি প্রদান করে। অনিল দত্ত কর্মজীবনের

বেশিরভাগ সময়টা কাজ নিয়েই ডুবে ছিল। একটি ডুবন্ত কোম্পানিকে প্রায় নিজের হাতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। এই কাজের মধ্যে ডুবে থাকার ফলেই হয়তো দাম্পত্য সম্পর্কের উষ্ণতা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তাই কোম্পানি যখন একটি সচ্ছল আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়ে গেছে তখন অনিল দত্তের কর্মজীবনের উদ্দীপনা কমে আসতে থাকে। এরা সৃজনশীলতার নতুন কোনও ক্ষেত্র বেছে নিতে পারে না। কোনও কিছু নতুন তৈরি করার ভাবনার শূন্যস্থান ভরাট করে নস্টালজিয়া। আর আমরা তো জানি কিছু বেদনা, গ্লানি মানুষ আজীবন বয়ে বেড়ায়। স্মৃতিচারণে ফুটে ওঠে সেই সব পুরানো বেদনা, গ্লানি। অনিল দত্তের জীবনেও আমরা সেটা খুঁজে পাই, ''... জানো নিবারণ আমি খাঁটি মফস্বলের ছেলে। একবার ফাইভ সিক্সে সরস্বতী পুজোর ভোরে ফুল চুরি করতে গিয়েছিলাম। এস ডি ও-র বাংলোয়। শেষরাতে থোকা থোকা গাদা ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি কোঁচড়ে ফেলছি— এমন সময় সপাং করে পিঠে চাবুক পড়ল। ভোর রাতে ফিরে তাকিয়ে দেখি এস-ডি-ও-র বেণী বাগানো মেয়ে— হাতে চাবুক। সে যে কি দীনতা— সে যে কি অপমান—''[৩৯] এরপর অনিল দত্তের স্বীকারোক্তি, সে কোনও দিনও আর প্রেম পাইনি। প্রেমের জন্য তৃষ্ণার্ত মন নিয়ে এদিক-ওদিক ছোটা-ছুটি করলেও একটা বড় শূন্য ছাড়া কিছু পায়নি। এই বিষয়টি অবিনাশের জীবনে বড় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। এই গ্লানি সারাজীবন বয়ে বেড়ালেও কর্মজীবনের শেষের দিকে অনিল দত্ত আরও বেশি করে অনুভব করেছে। তবে এই নস্টালজিয়াও জীবনের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ সৃষ্টি করে। জীবনের প্রতি মায়া থেকেই জীবনে প্রাপ্ত গ্লানি, বেদনা স্মৃতির দুয়ার ধরে তিরতির করে কাঁপে। মনে পড়ে কবির সেই বিখ্যাত লাইন,

''... কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধান সিড়ি নদীটির পাশে।''[৩০]

কর্মজীবনের শেষের দিকে অনিল দত্তের কাছে মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে ভালোবাসার অন্বেষণ। আর এই অন্বেষণকেই আমরা বলতে পারি জীবনের পথে আবর্তিত হওয়া। নিবারণের মত অনিলও উপলব্ধি করে, জীবনকে আস্বাদ্যময় করতে ভালোবাসা ছাড়া আর কোনও কিছুর গুরুত্ব নেই। লতার প্রতি অনিলের আকর্ষণ তো তাই বেঁচে থাকার উদ্দীপনা বজায় রাখা। এভাবেই মানুষ তার স্বভাব-চরিত্র-মানসিকতা অনুযায়ী জীবনের পথে আবর্তিত হয়।

একটি মানুষ ভালো আঁকতে পারত, গান লিখতে পারত; কিন্তু সে পথে আর এগোল না। বাঁধা বেতনের চাকরিতে ঢুকল, কিন্তু সেখানেও নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে, চাকরি ছাড়ল। তখন স্ত্রী রজনীকে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়তে হলো অভিনয় জগতের সঙ্গে। কারণ ছোট ছোট সন্তানসহ সংসার চালানোর ক্ষেত্রে পরিবারের সেটাই এক ও একমাত্র আয়ের রাস্তা। নিজের অভিনেত্রী স্ত্রী রজনীকে নিয়ে নতুন দল তৈরি করে নাটক মঞ্চস্থ করল। টাকা-পয়সার হিসাব দেখার দায়িত্বে স্বয়ং সেই মানুষটি। উদ্দেশ্য সংসারের আয়কে আরও সচ্ছল করে তোলা। দিনের পর দিন হাউসফুল সেই নাটক সফলতার নতুন অধ্যায় সূচনা করল, কিন্তু টাকার হিসাবে দেনার ক্রমবর্ধমান রূপ সামনে আসতে থাকল। আমরা 'সেই মানুষটি' বলতে 'অদ্য শেষ রজনী' উপন্যাসের শশাঙ্ক দত্তের কথা বলছি। এক্ষেত্রে একজন মানুষের অর্থাৎ শশাঙ্ক দত্তের বেঁচে থাকার উদ্দীপনা-উৎসাহ কী হতে পারে? শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের আঁকা বৈচিত্র্যময় জীবনের এক বৈচিত্র্যময় উদাহরণ হলো এই শশাঙ্ক দত্ত। যে বেঁচে থাকার জন্য কাজে লাগায় নিজের স্ত্রীর প্রতি ক্ষোভ, ঘৃণা, হিংসা ইত্যাদি অনুভূতিগুলোকে। অবশ্য এই অনুভূতিগুলোর পেছনে লুকিয়ে থাকে এক প্রকার হীনমন্যতাবোধ ও আত্মগ্লানি। মানুষ যে শুধু সৃজনশীলতার আনন্দ পায়, তা নয়; প্রতিশোধস্পৃহাও মানুষকে আনন্দ দেয়। আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক মানসিকতাকে অবলম্বন করেও জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। তবে এই অগ্রসরতা কি মানসিক স্বস্তি এনে দিতে পারে? তা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও এক ধরনের আনন্দ মানুষ অনুভব করতে পারে।

শিল্পী শশাঙ্ক দত্তের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে হয় তৎকালীন প্রখ্যাত অভিনেত্রী নীহারের মেয়ে রজনীর সঙ্গে যে নিজেও ছোটবেলা থেকেই থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু কালক্রমে শশাঙ্ক তার নিজের শিল্পীসত্তার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। বিশ্বাস হারানো মন প্রসব করে একরাশ বিরক্তি, অসন্তুষ্টি। ফলে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না বাঁধা-ধরা চাকরির নিয়মে। অন্যদিকে সংসার চালানোর অতিরিক্ত দায়িত্ব একার কাঁধে নিয়ে রজনীকে আরও জড়িয়ে যেতে হয় থিয়েটারের সঙ্গে। রজনীর এই সক্রিয়তাই যেন শশাঙ্কের নিষ্ক্রিয়তার যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তোলে। সবদিক থেকে ব্যর্থ শশাঙ্কের তখন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় নিজের স্ত্রী রজনীকে অপদস্ত, অপমানিত করার প্রচেষ্টা। যে অর্থ রোজগারের জন্য সংসারকে সেভাবে সময় দিতে পারত না রজনী— সেই অর্থ হাতিয়ে নেবার নানান ষড়যন্ত্র। এভাবেই যেন শশাঙ্ক নিজের অকর্মণ্যতার যন্ত্রণাকে ভুলিয়ে রাখতে চায়।

এক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য শশাঙ্ককে আরও উৎসাহিত করে তোলে। এতদিনে যেন সে জীবনের

উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে। রজনীকে ঠকানোর ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস জন্ম নেয়। আমরা আগেই বলেছি, বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য ছাড়া বেঁচে থাকার আনন্দ উপলব্ধি করা যায় না। জড়তা এসে আমাদের বেঁচে থাকার সমস্ত অনুভূতিকে বিস্বাদ করতে থাকে। তাই রজনীর বিরুদ্ধে বা রজনী সংশ্লিষ্ট 'পঞ্চমুখ' গ্রুপ থিয়েটারের বিরুদ্ধে নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ তথাকথিত নেতিবাচক হলেও এক ধরনের 'Pleasure' সৃষ্টি করে শশাঙ্কের মনে যা তাকে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়, জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করে। শশাঙ্ক জানে, লড়াই করতে হলে অর্থের প্রয়োজন। সৎভাবে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা না থাকতে পারে কিন্তু রজনীকে নানান ভাবে ঠকিয়ে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে ফেলে। যদিও এই অর্থ সংগ্রহের পেছনে শশাঙ্ক উদ্দেশ্য হিসাবে জানায় সন্তানের জন্য ভবিষ্যতকে নিরাপদ সুরক্ষিত করা। যদিও এই উদ্দেশ্য আমাদের কাছে দুর্বল লাগে কারণ ছেলে সন্তুকে খাতা-কলমের ব্যবসার জন্য জমানো লক্ষাধিক টাকা থেকে মাত্র তিনশো টাকা দিতে রাজি হয় না শশাঙ্ক। আর তাছাড়া রজনীও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সচেতন ও সতর্ক ছিল। যে অর্থ অবলম্বন করে শশাঙ্ক লড়াইয়ে নেমেছে যখন ছেলে সন্তুর নজর সেই অর্থে পড়ে, দু'জনই মুহূর্তে চলে যায় আদিম পৃথিবীতে। যে পৃথিবীতে মানুষের অনুভূতিগুলো (রাগ, ভালোবাসা, হিংসা ইত্যাদি) ছিল অনেক বেশি প্রকট ও প্রকাশ্য। সেখানে লড়াই ও মৃত্যু হাত ধরাধরি করে চলত। দু'জনের (শশাঙ্ক ও সন্তু) কাছেই এই লড়াই দু'জনের দিক থেকেই নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াই। যেমন শশাঙ্ক জানত এই অর্থের কথা যদি রজনী জানতে পারে বা সন্তু হাতিয়ে নেয়, তাহলে তার লড়াইয়ের প্রচেষ্টা মাঝমাঠেই মৃত্যু বরণ করবে। তার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাই এই আদিমতা, হিংস্রতা। কাহিনির শেষে শশাঙ্ক হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকে, তখন লেখক জানায়, ''শশাঙ্ক তখন চোখ বুজে নিজের বুকের ভেতরে নেমে পড়ে অন্ধকারে একটা লড়াই লড়ছিল। একা একা। স্থির হয়েও আসছিল একটু একটু করে।''[৪১] এই লড়াইটাই তাকে জীবনের পথে ধরে রাখতে সাহায্য করেছিল।

একজন দরবেশ মানুষ যিনি সংসার জীবনে প্রবেশ করেনি, প্রায় যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত, সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে সেভাবে কোনোদিন সম্পর্কই সাধিত হয়নি, জঙ্গলে একঘরে একটি পরিবারে জন্ম— বড় হয়ে ওঠা, মা-বাবার অকাল মৃত্যু, তারপর নানান গুপ্ত সাধন প্রক্রিয়ায় নিজেকে জড়ানো; এরকম একজন মানুষের জীবনে লড়াই কী রকম হতে পারে? তার জীবনে ভালোবাসার স্বরূপই বা কি? বেঁচে থাকার স্বাদ তিনি কোথা থেকে পান? কিংবা উৎসাহ-উদ্দীপনা-বিস্ময়-কৌতূহল যা আমাদের জীবনকে পুষ্টি জোগায়, একজন দরবেশের জীবনে তার উৎস কোথায়? এই সব প্রশ্নের

উত্তরের খোঁজে আমাদের দারস্থ হতে হয় 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা' উপন্যাসের মহম্মদ বাজিকর চরিত্রের কাছে। সে তন্ত্রসাধনায় জড়িয়ে গেলেও পরবর্তীকালে আর সেভাবে চর্চা করেনি। তবে জঙ্গলে বড় হয়ে ওঠার ফলে জঙ্গলের গাছ, পাতা, শেকড় ইত্যাদি তার গুণাগুণসহ জানে। সাপ ধরার ক্ষেত্রেও ওস্তাদ তিনি। বেঁচে থাকার ন্যূনতম চাহিদা ছাড়া সেভাবে কোনও পার্থিব প্রয়োজন কোনও দিন অনুভব করেনি মহম্মদ বাজিকর। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা আমরা দেখি বাজিকরের মধ্যে। এজন্যই গাছপালার ঔষধি জ্ঞান অর্জন করা বা তার ওপর নজর রাখা সাপকে ক্ষেত থেকে ধরে এনে খাঁচায় পোরা। জগেন পাগলা প্রসঙ্গে বাজিকর অনাথকে বলে, ''দেখুন বসুমশায়, স্মৃতি হারিয়ে মানুষ পাগল হয়, হাবা হয়, বোবা হয়। কিন্তু প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছে হারায় না। সে ইচ্ছে সর্ব অবস্থায় জেগে থাকে।''[৪২] এটাই তো প্রাণের আদি বৈশিষ্ট্য। তাই যাযাবর দরবেশের জীবন যাপনেও বেঁচে থাকার ইচ্ছা প্রবাহমান। আর যেখানে ইচ্ছার উপস্থিতি সেখানে লড়াইও বর্তমান। কারণ বেঁচে থাকার ইচ্ছা বিরুদ্ধ-পরিবেশ ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না। এটাই প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম।

মহম্মদ বাজিকর বাওড়ের জলে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করে ওষ্ঠকে। নিরাশ্রয় সর্বস্ব হারানো জগেন পাগলাকে আশ্রয় দেয়। অন্যের জীবনের কদর জীবনের প্রতি ভালোবাসাকেই চিহ্নিত করে। আবার এই বাজিকরমশাই অনাথের মাথায় নিজস্ব কিছু তৈরি করার আইডিয়া দেয়, ''আপনি আমার চেয়ে অনেক পরে দুনিয়ায় এসেছেন। এখনও আপনার সময় আছে। আপনার নিজের কোনো জিনিস তৈরি করতে ইচ্ছে করে না? আমার তো সে বয়স আর নেই।''[৪৩] অর্থাৎ তৈরি করার আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবনকে যে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়— এই জ্ঞান বাজিকরের ছিল। আর অনাথকে মাধ্যম করে হয়তো নিজের বহুদিনের অতৃপ্ত সাধের পরোক্ষ আস্বাদ পেতে চেয়েছে বাজিকর। জীবনের প্রতি বিস্ময়-কৌতূহল থেকেই এটা সম্ভব। আমরা এখানে 'জীবন' বলতে পারলৌকিক নয়, ঐহ্যিক জীবনের কথা বলছি। ঈশ্বরীতলার মায়ায় পড়ে যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে শেষপর্যন্ত এখানেই থিতু হয় মহম্মদ বাজিকর। স্মৃতিবিভ্রম হবার পর জগেন যাত্রাকে আশ্রয় দিয়ে তাকে নানা বিষয়ে শিক্ষাদান তো আসলে নিজের মত করে তৈরি করা যা হয়তো তাকে নিজস্ব কিছু তৈরি করার আনন্দ দেয়। ঈশ্বরীতলার মায়ার মধ্যে জগেন যাত্রাও একটি অন্যতম বিষয়। বেঁচে থাকার এই স্বাদ বাজিকরকে ঈশ্বরীতলায় থিতু হতে সাহায্য করে। একটি জীবন তৈরির মধ্য দিয়ে জীবনের পথে আবর্তিত হতে সাহায্য করে।

একজন মানুষের যদি ইচ্ছে মরে যায়, জীবনে অবাক হবার মত যদি কিছু না পায়, পৃথিবীটা যদি হয়ে যায় বাসি রুটি; তাহলে তার জীবন কেমন হতে পারে? সেই জীবন যেন বাজে-পোড়া মরা

সুপুরি গাছ। ঝড়ের সময় বিনা বাধায় ঝরে পড়ে। খগেনের কথায় এভাবেই 'স্বর্গের আগের স্টেশন' উপন্যাসের বিজন বসু মুখ থুবড়ে পড়ে। বিজন খগেনকে দেখাতে চেয়েছিল সত্যি তার কোনও ইচ্ছা নেই। বিজনের ঈশ্বরীতলায় আসার কারণ দুটো চিঠি। একটি বৌদি সিদ্ধেশ্বরীর, আর একটি স্ত্রী শিবানীর চিঠি। বৌদির চিঠিতে খগেন ও শিবানীকে নিয়ে আশঙ্কার কথা অন্যটিতে খগেন সম্পর্কে মুগ্ধতার কথা। তাহলে সত্যিই কি বিজনের সব ইচ্ছার মৃত্যু ঘটেছে? খগেন বলে, ''... সবাই আজকাল বলে ইচ্ছে নেই! আসলে ষোল আনা ইচ্ছে আছে সবার। মনোমতো সময়মতো সুযোগ আসে না তো— তাই।"[৪৪] যেমন একটা সময় এই খগেনই বিপিনবাবুকে বলেছিল ইচ্ছে না থাকার কথা। কিন্তু বিপিনবাবুর সঙ্গে পরিচয় হবার পরেই তার সাধপূরণের কথা মাথায় আসে— জেগে ওঠে নানান সুপ্ত ইচ্ছা। আসলে লেখক যেন এখানে কোনও মানুষের আংশিক ইচ্ছার মৃত্যু ঘটতে পারে, সেটাই বিজনের মাধ্যমে দেখিয়েছেন। এতে বেঁচে থাকার সামগ্রিক ইচ্ছাকে প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু কখনোই একেবারে নিঃশেষ করতে পারে না। না হলে কেনই বা দু'টো চিঠির আশঙ্কা ও প্রশংসার কথা শুনে বিজন শহর থেকে ছুটে আসবে ঈশ্বরীতলা গ্রামে। যেন এক অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে সে গ্রামে এসে দাদার বাড়িতে প্রবেশ না করেই ছুটে যায় খগেনকে দেখতে। খগেনের কাছে বারবার জানতে চায়, সে ঠিকভাবে পড়তে পেরেছে কিনা। বিজন রাতে খাওয়া প্রচুর বিলিতি মদ রোজ সকালে বুকডন দিয়ে ঘামের মাধ্যমে ঝরিয়ে ফেলে।

আসলে বিজন এখানে দিক-হারানো ছেলে। সময়ের স্রোতে কিছু ইচ্ছার মৃত্যু ঘটেছে নিশ্চয় এবং নতুন করে ইচ্ছা জাগাতে পারেনি বা ইচ্ছার মধ্যে তেমন শক্তির সঞ্চার করতে পারেনি কিন্তু প্রাণের আদিমতম বৈশিষ্ট্য বেঁচে থাকার ইচ্ছার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। খগেন বিজনকে বলে, ''... তোমার মতো একটি সাপ আছে এখানে। তিনি আজি দু'মাস ধরে আমায় লেজে খেলাচ্ছে। গাছের, ঘাসের, আলোর, পোড়ো ইটের রঙে গায়ের রঙ মিলিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। দেখা দেয়— আবার ডুবে যায়। কিছুতেই ধরা যায় না।"[৪৫] বিজন যেন এই সাপের মত ধরা দিতে না চাওয়া মানুষ যে ভিড়ের ভেতর ভিড় হয়ে মিশে যেতে চায়, আলাদা করে চিহ্নিত হতে চায় না। এটাও তো এক ধরনের লড়াই— ব্যক্তি জীবনকে অসংখ্য জীবনের মাঝে মিশিয়ে দেবার লড়াই। তবে নারীকে দখলে রাখার ইচ্ছা (শিবানীর প্রতি) সেভাবে আর নেই। তবে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেলে পুনরায় তা জাগবে না, তা বলা যায় না। কারণ খগেনকে দেখে জেলাস হওয়া, শিবানীকে নগ্ন অবস্থায় দেখতে চাওয়া, সেটা তারই ইঙ্গিত বহন করে। তবে এই ইচ্ছাগুলো শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, বিজনের আচমকাই নাক

ডাকার মধ্য দিয়ে তা বোঝা যায়। তবে কিছু ইচ্ছা আছে হয়তো যার জন্য সে প্রতিবাদী আচরণ করে দাদা বিপিন বসুর বিরোধিতা করে। সেরকম একটি ইচ্ছা মাদা মেছো কেউটেকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দেওয়া। এই বিষয়ে দাদার সঙ্গে তর্ক, দাদার বাড়িতে রাত পার হলেই চলে যাবার সিদ্ধান্ত এবং শেষপর্যন্ত চলে যাবার সময় মাদা কেউটেকে খাঁচা থেকে মুক্তি দেওয়া। বিজনের হয়তো ইচ্ছে মাদা কেউটেকে ধরে না রেখে মাদী কেউটে ধরার ক্ষমতা গুণিন খগেনের আছে কিনা তা দেখার বা মাদী কেউটেটা যাতে ধরা না পড়ে তার জন্য মাদাকে ছেড়ে দেওয়া কিংবা মাদীর সঙ্গে মিলিত হবার প্রবল ইচ্ছায় গজরানো মাদার ইচ্ছাপূরণ করা। এখানে আরও একটি গূঢ়ার্থ থাকতে পারে। খগেন প্রথমদিকে বিজনকে ধরা না পড়া মাদি কেউটের সঙ্গে তুলনা করেছিল। মাদাকে আটকে রাখা হয়েছিল মাদীকে সহজে ধরার জন্য। বিজন যেন নিজের সুপ্ত ইচ্ছাগুলো ধরা পড়ে যাক— এটা সে চায় না। তাই যেন তার তাড়াতাড়ি ঈশ্বরীতলা ছেড়ে চলে যাওয়া। কারণ এখানে এসেই সে প্রথম জেলাস হচ্ছে, শিবানীকে নগ্ন দেখতে চাইছে— কে বলতে পারে ঈশ্বরীতলায় খগেনের সঙ্গে, দাদার সঙ্গে থাকতে থাকতে ইচ্ছা জাগরণের ব্যক্তিস্বরূপটা সকলের সামনে যাতে ধরা না পড়ে যায়। আসলে বেশির ভাগ লোক তো প্রয়োজনাতিরিক্ত আগ্রহে ভোগে না বা কিছু একটা বানিয়ে তোলার বিস্ময়ে ভোগে না। বিজন তো এই সাধারণের ভিড়েই মিশে যেতে চায়। আর মাদী কেউটেটা যেন তারই প্রতিনিধি। তাই মাদাকে ছেড়ে দেয় যাতে মাদী ধরা না পড়ে। যাইহোক, মাদার বাইরে বেরোনোর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের স্বাধীন থাকার ইচ্ছাকেই যেন সে জাহির করে। স্বাধীন থাকার ইচ্ছেও মানুষকে জীবনের পথে আবর্তিত করে। ভিড়ে মিশে থাকার ইচ্ছা আসলে অসংখ্য জীবনের মাঝে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা। সময় ও সুযোগ সেই ভিড় থেকে ব্যক্তি মানুষকে পৃথক করে। সময় ও সুযোগ কারও ইচ্ছায় শক্তি সঞ্চার করে, কারও ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে বা জন্ম দেয়। তাই বিজন বসু উপন্যাসে সাময়িক দিক-হারানো মানুষ কিন্তু জীবনের পথে আবর্তিত হওয়া।

'চন্দনেশ্বর জংশন' উপন্যাসে অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথম থেকেই দেখি টাকার জন্য অন্যের কাছে সর্বদা হাত পাততে। বিশেষ করে ঐ অঞ্চলের ধনী মানুষ নাদু শা-র কাছে। আসলে তীব্র আর্থিক অনটনের জন্য জোত-জমি-বাড়ি-পুকুর সব বন্ধক দেওয়া হয়ে গেছে। এমনকি বাড়ির উঠোনে গজানো দামি ঘাসও বিক্রি করা হয়ে গেছে। ভাগচাষি হিসাবে ভাগের ধানও দিতে পারেনি নাদুকে। তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকা অনন্ত তারপরেও নিজেকে সংযত রাখতে পারে না ঘোড়ার রেসে টাকা লাগানো থেকে। যেখান থেকে যতটুকু টাকা সংগ্রহ করতে পারে তখন খাবারের পরিবর্তে রেসের কথা মাথায়

আসে। মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি, টাকা-পয়সা, গর্ব-ঔদ্ধত্য-অহংকার সবই সময়ের প্রভাবে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। শুধু থেকে গিয়েছে একটি সর্বনাশা শখ যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মরীচিকাবৎ আশা। যতদিন পর্যন্ত নাদু তাকে তার বিধবা মেয়ের পাত্র খোঁজার দায়িত্ব দেয়নি ততদিন পর্যন্ত কিন্তু অনন্ত বারবার এই আশা নিয়ে রেসের মাঠে ছুটে গিয়েছে যে সেখানে টাকা জিতলে তার অবস্থার আমূল পরিবর্তন হবে। অনেকে বলতে পারে জুয়া খেলা একটি অভ্যেস যেখানে আশার চেয়ে লোভের গুরুত্ব বেশি। কিন্তু আমরা যদি অনন্ত বাড়ুয্যের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব তার এই বার্ধক্য অবস্থায় সাংসারিক তীব্র অনটন ঘোচাতে বা এক সময়ের সচ্ছল স্বাচ্ছন্দে বড় হয়ে ওঠার পরিবেশ কিছুটা ফিরিয়ে আনতে জুয়া ভিন্ন আর কোনও পথ নেই অনন্তের কাছে। দু'জনের সংসারে চাহিদা সামান্য থাকলে অনন্তর চালানো অসুবিধা ছিল না কিন্তু সচ্ছল সময়ে পাওয়া শখ পরবর্তীকালে অভ্যেসে পরিণত হয়ে যায়। আর অবস্থার চরম দূর্বিপাকে পড়ে অবস্থা ফেরাতে লোভ ও আশার সংমিশ্রিত রূপ ধারণ করে ঘোড়ার রেস। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়, অনন্তকে তার অবস্থা ও শখের জন্যে বারবার হেনস্থা বা অপমানিত হতে হয়, কিন্তু তারপরেও সে চেষ্টা ছাড়ে না। জীবন তাকে আর কতটা খারাপ অবস্থায় ফেলতে পারে— সেটা দেখার জন্যই যেন সে এই সব অসম্মান-অপমান গায়ে মাখে না। এ যেন জীবনের পথে থেকেই জীবনের বিরুদ্ধে জেহাদ। ভাগ্যের চাকা নিজের দিকে ঘোরাবার নিরন্তর চেষ্টা জীবনের সায়াহ্নে পদার্পণ করেও।

এই উদ্দীপনা উৎসাহই তো আমাদের জীবনের মূল চালিকাশক্তি। তাই অনন্ত বাড়ুয্যে যখন বুদ্ধি করে নাদু শীর কাছে তার মেয়ের পাত্র খোঁজার দায়িত্ব নেয় অর্থের বিনিময়ে তখন উদ্দীপনা-উৎসাহই পাত্রের খোঁজে মাঠের পর মাঠ, রাস্তার পর রাস্তা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে সাহায্য করে। এই উদাহরণই প্রমাণ করে যে, অনন্তর রেসে টাকা লাগানোর পেছনে শুধুমাত্র লোভ ও অভ্যেস উদ্দীপক হিসাবে কাজ করেনি। লেখক বলেন, ''তবু অনন্ত জ্ঞানোবাবুর গল্পটি শুনতে লাগল। আর শুনতে শুনতে লক্ষ্য করল, সে আসলে কিছুই শুনছে না। চোখের সামনে তার একখানাই ছবি শুধু। সে ছবি হল— নাদু নিজে দাঁড়িয়ে অনন্তকে তার জমি জায়গা ঘরবাড়ির বন্ধকি দলিলখানা দিয়ে দিচ্ছে।''[৪৬] এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আসলে অনন্ত বাড়ুয্যে এই বয়সেও রেসের পেছনে ছোটে, নাদু শীর মেয়ের জন্য পাত্র জোগাড়ের জন্য ছোটে। যদিও অনন্ত তার স্ত্রীকে নাদু শীর মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজার কাজকে অর্থ লোলুপতার বদলে এই বলে যুক্তিযুক্ত করতে চায় যে, এক কম বয়সী মেয়ের জীবন বিধবা থাকার জন্য যাতে নষ্ট হয়ে না যায়— সেই জন্যে অশক্ত শরীরেও তার এই

তৎপরতা। নিজের এই অবস্থার দুর্বিপাকেও অনন্তর এই ভাবনা জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসার পরিচয় বহন করে। তাই অনন্তর পরিশ্রমে এই ভাবনাও উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের এই চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে যে, মানুষ শেষপর্যন্ত লড়াই করে তার স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষার জন্য। জীবনের নানা বাধা-বিপত্তি, সময়ের হেরফের জীবনের বেঁচে থাকার ইচ্ছাকে কখনোই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করতে পারে না। যদি করত তাহলে এতোদিন অনন্ত বাড়ুয্যে একজন জড়াগ্রস্ত মানুষে পরিণত হতো। ভাগ্য বা সময়ের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একজন মানুষ তার জীবনের প্রতি অধিকারের দাবি রাখে, তার জন্য লড়াই করে— অসহায় আত্মসমর্পণ প্রাণের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য নয়। অনন্ত এখানে হৃদয় নস্করে প্রতিফলিত জীবনদৃষ্টিকেই পুষ্টি দান করেছে।

'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসের স্বাতীর প্রায় একই রকম অবস্থা ছিল অনন্তর মতো। দিলীপ বলেছে, ''... তোমরা তখন সবে গরীব হতে শুরু করেছো। তোমার দাদারা ওড়াতে শিখেছে। বাবা সবে মারা গেছেন। তোমাদের বাড়ি কলকাতায় একখানায় এসে ঠেকেছে। সে বাড়িরও আষ্টেপৃষ্ঠে ভাড়াটে। সকাল সন্ধ্যে উনুনের আঁচে অন্ধকার হয়ে যায় সিঁড়িঘর—''[৪৭] স্বাতীর আর্থিক অবস্থা এরপরে আরও খারাপ হয়। সন্তানসহ এই বিশাল পৃথিবীতে তাকে একক লড়াইয়ে নামতে হয়। কিন্তু তারপরেও হতাশা স্বাতীর জীবনে কখনও চিরস্থায়ী বাসা বাঁধতে পারে না। নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাহায্যে ক্রমশ জীবনের পথে অগ্রসর হয় সে। লেখকের সৃষ্ট জগতে মানবের এই লড়াইকেই জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ বিবিধ হতে পারে কিন্তু মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শেষপর্যন্ত লড়াই করে। 'হাওয়াগাড়ি' উপন্যাসে স্বাতীর ঘটনাপ্রবাহ লেখকের এই জীবনদৃষ্টিকেই প্রতিফলিত করে। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসগুলোতে নায়ক বা নায়িকা চরিত্র (Protagonist) ব্যতীত অন্যান্য চরিত্রেও জীবনের এই মৌলিক অধিকার, দাবি, লড়াইয়ের কথাই বলেছেন। বলেছেন মানুষের অপরাজেয় মানসিকতার কথা। আমরা এই অধ্যায়ের দুটি অংশে নির্বাচিত উপন্যাসের নির্বাচিত চরিত্রের মাধ্যমে এই বক্তব্য প্রমাণিত করেছি।

তথ্যসূত্র:

১. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'জীবনরহস্য', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: পৌষ ১৩৯৯, পৃ. ২০৫।

২. তদেব, পৃ. ২২৭

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩২।

৪. তদেব, পৃ. ৫৪

৫. তদেব, পৃ. ৫৪

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'আরণ্যক', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ১০৩

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৬৪।

৮. তদেব, পৃ. ১৪৬

৯. তদেব, পৃ. ১৮১

১০. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অনিলের পুতুল', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ২১৮।

১১. তদেব, পৃ. ২৫১

১২. তদেব, পৃ. ২১৩

১৩. তদেব, পৃ. ২৩৫

১৪. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'একটি উপন্যাসের আয়ু', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৫৩২।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৫৩।

১৬. তদেব, পৃ. ৩৩৯

১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'কি লিখতে চাই', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৪৯১।

১৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'স্বর্গের আগের স্টেশন', রচনাসমগ্র-৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১৭।

১৯. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'চন্দনেশ্বর জংশন', রচনাসমগ্র-৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, ভূমিকা অংশ, পৃ. ১২৯

২০. তদেব, পৃ. ১৬২

২১. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', রচনাসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, তদেব, পৃ. ১৪

২২. তদেব, পৃ. ৯৭

২৩. তদেব, পৃ. ১১২

২৪. তদেব, পৃ. ১১৪

২৫. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অদ্য শেষ রজনী', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২, পৃ. ২৯০

২৬. তদেব, পৃ. ২৮৩

২৭. তদেব, পৃ. ৩৪১

২৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'হাওয়াগাড়ি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ৭

২৯. তদেব, পৃ. ৮৪

৩০. তদেব, পৃ. ১০৮

৫১. তদেব, পৃ. ১৫৪

৩২. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'শেষ বিকেলের আলো', করুণা প্রকাশনী, ১৮ এ, টেমার লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ: বইমেলা-১৯৯৯, পৃ. ৮৮

৩৩. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অর্জুনের অজ্ঞাতবাস', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ১০১।

৩৪. তদেব, পৃ. ১০২

৩৫. দাশ, জীবনানন্দ, 'আট বছর আগের একদিন', জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৫৪, পৃ. ৭৪

৩৬. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অনিলের পুতুল', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ২৫০।

৩৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'কুবেরের বিষয় আশয়', রচনাসমগ্র-১, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৩৪৮।

৩৮. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'নির্বান্ধব', রচনাসমগ্র-২, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জুলাই ২০১১, পৃ. ৪৭।

৩৯. তদেব, পৃ. ৫২

৪০. দাশ, জীবনানন্দ, 'হায় চিল', জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩, প্রথম প্রকাশ: মে ১৯৫৪, পৃ. ৬৩

৪১. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'অদ্য শেষ রজনী', রচনাসমগ্র-৩, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: এপ্রিল ২০১২, পৃ. ৩৯০

৪২. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'ঈশ্বরীতলার রূপোকথা', রচনাসমগ্র-৪, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৪২

৪৩. তদেব, পৃ. ৮৩

৪৪. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'স্বর্গের আগের স্টেশন', রচনাসমগ্র-৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১০৩

৪৫. তদেব, পৃ. ১০৪

৪৬. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'চন্দনেশ্বর জংশন', রচনাসমগ্র-৫, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ১৬৬-১৬৭

৪৭. গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল, 'হাওয়াগাড়ি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ: ভাদ্র ১৩৮৬, পৃ. ৪৭।